প্রথম প্রকাশ ঃ
এপ্রিল ১৯৫৭

প্রকাশক ঃ
অনুপ সাহা
৭ই, শীতলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৫

মুদ্রাকর ঃ
জি শীল
ইম্প্রেসন প্রবলেম
২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৫

প্রচ্ছদ ঃ কুমারঅজিত

যাদের একান্ত আগ্রহে এ বই প্রকাশিত হ'ল

শ্রীসহদেব সাহা

শ্রীস্বপন সাহা

প্রীতিভাজনেষু

মডার্ণ কলাম প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস (১ম খণ্ড)	২৫·০০
ক্রিমিনাল অমনিবাস (দুই খণ্ডে) সম্পাদনা ঃ কনিষ্ঠ পাণ্ডব	৩০·০০
লাস্ট ফ্রন্টিয়ার ॥ অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন	১৮·০০
সানি গাভাসকার ॥ জয়ন্ত দত্ত (২য় মুদ্রণ)	১১·০০
ড্রাগনের মুখে ব্রুস লী ॥ জয়ন্ত দত্ত	৭·০০
কখন খেলার ছলে ॥ জয়ন্ত দত্ত	৬·০০
মৃত্যুর চোখ নীল ॥ জন ল্যাণ্ড	১১·০০
দাঁড়ান ! অন্ধকার হোক ॥ হেনরী স্লেজার	১০·০০
নিষিদ্ধ প্রবেশ ॥ ডরোথি সেয়ার্স	১০·০০
ডায়ের সংকেত ॥ এলারী কুইন	১০·০০
দুঃস্বপ্নের রাত্রি শেষে ॥ দ্বৈপায়ন	৭·০০
একই বৃত্তে ক'জন ॥ শেখর সেনগুপ্ত	৫·০০
সমুদ্র মন্থনে বিষ ॥ সঞ্জয় দাশগুপ্ত	৮·০০

॥ এক ॥ বনচর-কাপ্তেন

"পি এইচ্ ওয়াই জে এস এল ওয়াই ভি ডি কিউ এফ ডি জেড্ এক্স জি এ এস জি জেড্ জেড্ কিউ কিউ ই এইচ্ এক্স জি কে এফ এন ডি আর এক্স ইউ জে ইউ জি আই ও সি ওয়াই টি ডি এক্স ভি কে এস বি এক্স এইচ এইচ ইউ ওয়াই পি ও এইচ ডি * এইচ্ ডি"

ইংরেজী বর্ণমালার এলোপাতাড়ি সাজানো কতগুলো অক্ষর।

যে লোকটার হাতের কাগজখানায় উপসংহারে ওই বিচিত্র অক্ষর-গুলো সাজানো তাকে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন দেখা গেলো।

ওটাতে প্রায় শ'খানেক ওই রকম লাইন ছিলো, অক্ষরগুলোর মধ্যে ফাঁক সমান সমান কিন্তু ওগুলো দিয়ে কোন অর্থবহ কথা তৈরী হয়নি। বর্ণমালা ছড়ানো শক্ত দামী কাগজখানায় মহাকালের তামাটে হাতের সুস্পষ্ট ছাপও বেশ ভালো করেই পড়েছে।

অক্ষরগুলো সাজানোর পদ্ধতি কি কাগজখানা যার কাছে ছিলো বোধ হয় তার পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। এ ধরনের সাঙ্কেতিক বর্ণমালা যেন অনেকটা সেই লোহার সিন্দুকের তালার মত, কিছু অক্ষর সাজানোর কৌশল। আসলে তালাটা খুলতে গেলে বিশেষ একটা কথা জানা চাই-ই চাই, সাঙ্কেতিক লেখাটা পড়তে গেলেও সেই একই ব্যাপার, কৌশলটা আগেভাগেই জানা দরকার।

এইমাত্র আবার মারপ্যাঁচ দেওয়া সাঙ্কেতিক লেখাটার পাঠোদ্ধার যে করলো, সে সাধারণ এক বনচর-কাপ্তেন ছাড়া কিছু না। পালিয়ে যাওয়া দলছুট ক্রীতদাসদের ধরে আনার কাজ যারা করে, ব্রাজিলে তাদের বলা হয় 'কাপিতা দ্যু মাতো'। আসলে লোকগুলো বনচর কাপ্তেনই। ব্যাপারটা চলে আসছে সেই ১৭২২ সাল থেকে। ওই মান্ধাতার আমলে

ক্রীতদাস প্রথা দূর করার চিন্তা মাত্র দু-একজন চিন্তাশীল মানুষের মাথাতেই খেলেছিলো, আরো শ'খানেক বছর কাটার আগে ব্যাপারটা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায়নি। মানুষ যে আবার একটা স্বাধীন-জীব, মুক্ত স্বাধীন থাকাই যে তার প্রথম অধিকারের মধ্যে পড়ে, সে যে নিজেই শুধু নিজের মালিক, এমন একটা ধারণা জন্মাতে কম করেও প্রায় হাজার বছর কেটেছে। ব্যাপারটা মেনে নিতে দুনিয়ার সভ্য মানুষের কম দিন লাগেনি।

আমাদের এই কাহিনী যখন সুরু হচ্ছে সেই ১৮৫২ সালে ব্রাজিলে তখন ক্রীতদাস প্রথা বেশ বহাল তবিয়তেই ছিলো, ফলে বনচর-কাপ্তেনদেরও পালানো গোলামদের খুঁজে বের করতে হতো। রাজনীতির কৌশলগত খেলাতেই ক্রীতদাসদের ক্ষমা করার ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই দেরী করা হচ্ছিলো। তবে কালাদের অবশ্য এক ধরনের মুক্তিপণ দেওয়ার কিছু সুযোগ ছিলো। তাদের সন্তান-সন্ততি জন্মালে তারা আর গোলাম হতো না। তবে তেমন দিনের আর দেরী ছিলো না, ইউরোপের তিন ভাগ ঢুকিয়ে দেওয়া যায় অমন সুন্দর দেশটায় যখন কপাল খুঁড়লেও একজনও ক্রীতদাস পাওয়া যাবে না দেশের এক কোটি মানুষের মধ্যে।

বনচর-কাপ্তেনদের কাজে-কর্মে ভাঁটা পড়তে সুরু হলো। পালিয়ে বেড়ানো ক্রীতদাসদের ধরে আনার জন্যে পুরস্কারের ভাগও কমে আসছিলো। তবুও মাঝে মাঝেই যখন তাদের ডাক পড়তো, ব্যাপারটা বেশ লাভেরই হতো। বনচর-কাপ্তেনরা মোটামুটি একটা দল বানিয়ে ফেলেছিলো। লোকগুলো হয় ছাড়া পাওয়া ক্রীতদাস আর না হয়তো সেনাবাহিনী ছেড়ে পালানো লোক। সুনাম বলতে কিছু ছিলো না। আসলে লোকগুলো সমাজের নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ—সাঙ্কেতিক লেখাটার মালিক আমাদের গল্পের লোকটাও 'কাপিতা দ্যু মাতো' দলের যোগ্য লোকই সন্দেহ নেই। লোকটার নাম, টরেস। অন্য সব বনচর-কাপ্তেনদের মতো এ লোকটা আধা ইণ্ডিয়ান বা আধা নিগ্রোর মতো

বর্ণসঙ্কর ছিলো না। লোকটা সাচ্চা ব্রাজিল বংশের ছেলে, পেটে বিছে-বুদ্ধিও কিছু যে না ছিলো তাও নয়—অবশ্য এখন লোকটাকে দেখলে সেটুকু বোঝার উপায় নেই। ব্রাজিল দেশের আইনে তখন সাদা-কালোর মিলন জাত মানুষের পক্ষে কিছু কিছু কাজ জোটানোয় বাধা ছিলো। তবে এ লোকটা ওর জঘন্য চরিত্রের জন্যেই কোনো কাজ কর্ম জোটাতে পারেনি।

টরেস আপাতত ব্রাজিলের ধারে কাছেও ছিলো না। সীমান্ত পার হয়ে সে আপাতত পেরুর গহন-অরণ্যে ঘুরছিলো—এখান থেকেই উত্তর আমাজনের ঢল নেমেছে।

লোকটার বয়স প্রায় বছর ত্রিশ। ওর বিচিত্র স্বভাব আর লোহার মত শরীরের বাঁধুনির জন্যেই অনিশ্চিত ছন্নছাড়া জীবন কাটানোর কোনো চিহ্ন শরীরে কোথাও দাগ ফেলতে পারেনি। লোকটার উচ্চতা মাঝারি, বৃষ-স্কন্ধ, দোহারা গড়ন, দৃপ্ত চালচলন, গ্রীষ্মমণ্ডলে ঘোরা-ফেরা করার ফলে গরম বাতাসের প্রকোপে মুখের রঙ পোড়া বাদামী। মুখে এক গোছা কালো দাড়ি, উঁচু ভ্রূ'র মধ্যে কোটরগত চোখ প্রায় অদৃশ্য। দৃষ্টি চকিত। পোশাকে আতিশয্য নেই, যথেচ্ছ ব্যবহারের চিহ্নই শুধু প্রকট। মাথার এক পাশে বসানো চামড়ার লম্বা কানওয়ালা টুপি। জুতোর ডগা পর্যন্ত ঝুল নামানো ট্রাউজার মোটা পশমে তৈরী, শরীরে এটাই ওর সবচেয়ে চোখে পরার মত পোশাক, এর ওপর সবকিছু ঢাকা একটা হলদে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া 'পঞ্চো' আলখেল্লায়।

কিন্তু টরেস বনচর-কাপ্তেনদের একজন হলেও চাকরিটা আর নেই। কালাদের ধরার জন্য অগ্নেয়াস্ত্রও নেই—না বন্দুক না রিভলবার। কোমর-বন্ধে ঝুলছে শিকারের ছোরার বদলে বরং কিছুটা তরোয়ালের কাছা-কাছি একটা 'ম্যান চেট্রা', এছাড়া 'এনকাডা' নামের আগাছা কাটা অস্ত্র। শেষের অস্ত্রটা উত্তর আমাজনের জঙ্গলের গিনিপিগ জাতীয় একরকম জন্তু তাড়াতেই লাগে। হিংস্র না হলেও জঙ্গলে ওগুলো আছে প্রচুর।

১৮৫২ সালের মে মাসের ৪ তারিখের ঘটনা। সেই লোকটি

সাঙ্কেতিক লেখায় ভরা কাগজখানা পড়ছিলো—ওর চোখ নিবিষ্ট হয়েছিলো কাগজখানার ওপর। দক্ষিণ আমেরিকার বন-জঙ্গলে বাস করায় পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে একটুও ওর মাথাব্যথা ছিলো না। চারদিক থেকে ক্রমাগত ভেসে আসা বাঁদরের কিচিরমিচির, ঝুমঝুমি সাপের রুণুঝুণু আওয়াজ, সাপগুলো আবার হিংস্র না হলেও সাংঘাতিক বিষধর, অথবা শিঙেল ব্যাঙের ডাক, এগুলোও ভয়ঙ্কর জীব, অথবা একঘেয়ে ক্লান্তিকর উঁচু পর্দার ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, এর কোনটাই ওর মনযোগ নষ্ট করতে পারলো না।

একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আরাম করেই বসেছিলো টরেস—ওই 'পাও ফেরো' বা লোহা-কাঠ গাছের চমৎকার নিটোল পাতাগুলোর তারিফ ও একবারও করলো না। ও কেবল চিন্তামগ্ন হয়ে সেই কাগজখানাই বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলোর গোপন রহস্য ওর আর অজানা নেই, প্রত্যেকটা বর্ণমালার সঠিক অর্থটা ও আউড়ে যেতে লাগলো। আস্তে আস্তে ওর মুখখানায় একটা মৃদু-হাসি ছড়িয়ে পড়লো। একটা দারুণ কুটিল-হাসি।

'হুঁ' আপনমনেই ও বলে উঠলো, 'এখানে দেখছি শ'খানেক লাইন চমৎকার ভাবেই লেখা, কারো কাছে যে ব্যাপারটার বেশ গুরুত্ব আছে তাতে সন্দেহ নেই। লোকটা নিঃসন্দেহে ধনী। এটা যে লোকটার কাছে মরণ-বাঁচন সমস্যা তাতেও সন্দেহ নেই।' লোভাতুর চোখে কাগজটায় একবার নজর বুলিয়ে ও আবার বলে উঠলো, 'শেষ কথাগুলোর প্রত্যেকটা অক্ষরের জন্যে এক 'কণ্টো' বা তিন হাজার ফ্রাঁ হলে অনেক অনেক টাকাই দাঁড়াবে। শেষের অক্ষরগুলোর মধ্যেই সব টাকার কথা আছে। সব লেখাটারই তাহলে মানে বোঝা যাবে। ঠিক ঠিক লোকগুলোর নামও এতে আছে। হুঁ, এসব বোঝার আগে এতে কতগুলো সংখ্যা আছে জেনে নেবার চেষ্টাই আগে করি, না হলে ঠিক মানেটাও বুঝবো কিনা সন্দেহ।'

কথা শেষ করেই টরেস মনে মনে গোনা সুরু করলো।

'এতে আটান্নটা শব্দ আছে। তার মানে, আটান্নটা কন্টো। শুধু এই নিয়েই যে কেউ ব্রাজিল বা আমেরিকায় যেখানে খুশি মহানন্দে কাজকর্ম না করেই কাটাতে পারে। তাছাড়া কেউ যদি ওই রকমভাবেই কাগজখানার সব অক্ষরগুলোর দাম দেয় শ'য়ে শ'য়ে কন্টোই ওর দাম হবে। আঃ! যদি আকাট মূর্খ না হই কপাল আমার নির্ঘাত ফিরে যাবে!'

টরেসের মনে হলো এখনই হাত দিয়ে সাতরাজার ধন স্পর্শ করছে, মুঠো মুঠো সোনা যেন ওর হাতের মধ্যে এসে গেছে। আচমকাই ওর অন্য কিছু মনে পড়লো।

'যাই হোক', বিড় বিড় করে উঠলো ও, 'মাটিতে তো পৌছেছি, ভ্রমণটা নেহাত মন্দ হয়নি। আতলান্তিকের উপকূল থেকে উত্তর আমাজনের তীর। তবে ওই লোকটা আমেরিকায় যাবে বলে যদি সমুদ্র পার হয়, তাহলে ওর নাগাল পাবো কেমন করে? কিন্তু না, লোকটা ওখানেই আছে, এই গাছটার মগডালে উঠলেই যে বাড়িটায় ও ছেলে-বউ নিয়ে আছে সেটা দেখতে পাবো।' হাতের কাগজখানা নাড়তে নাড়তে সাংঘাতিক কিছু একটা ভেবে নেয় টরেস, 'কালকের আগেই ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবো, লোকটা কালকের মধ্যেই জানতে পারবে ওর মান সম্ভ্রম আর জীবন এই লাইনগুলোর মধ্যেই রয়েছে। আর তারপর ও যখন সাঙ্কেতিক লেখাটা পড়তে জানে বলে সেটা দেখতে চাইবে···ও ওর সর্বস্ব দিতে বাধ্য হবে। আর আমার প্রিয় বন্ধু! কি উপকারই আমার করেছো সাঙ্কেতিক কাগজখানা আমাকে দিয়ে আর তার পুরনো দোস্তকে কোথায় পাবো, সে কি নামেই বা গা-ঢাকা দিয়ে আছে এতোকাল, সেকথা জানিয়ে। আঃ! লোকটা সন্দেহই করতে পারছে না যে ওই আমার ভাগ্য ফেরাবার চাবিকাঠি।'

শেষ বারের মতো হলদে কাগজখানার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো টরেস, তারপর সাবধানে ভাঁজ করে একটা ছোট্ট তামার পয়সা রাখার বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো। বাক্সটার আকার চুরুটের বাক্সের মতই

বড়ো আর ওটার মধ্যে যা আছে তাতে টরেসকে কেউ আর পয়সা-ওয়ালা মানুষ বলবে না। গোটা কয়েক আশে-পাশের রাজ্যের পয়সাই ওর সম্বল—দশটা কলম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রের শকুন-মার্কা ডবল সোনার টাকা, দাম প্রায় একশ ফ্রাঁ, কিছু ওই রকম দামের ব্রাজিলের রেইস মুদ্রা, পেরুর কিছু স্বর্ণমুদ্রা, দাম আগের গুলোর দুগুণ, কিছু চিলির পঞ্চাশ ফ্রাঁ দামের এস্কিউডো, আরও কিছু খুচরো, মোট সবগুলোর দাম পাঁচ শ' ফ্রাঁ'র চেয়ে বেশি হবে না—আর তাছাড়া এগুলো কোথা থেকে কিভাবে ওর হাতে এসেছি প্রশ্ন করলে টরেস যে বেকায়দায় পড়বে নিঃসন্দেহ। তবে একটা ব্যাপার ঠিক, কয়েক মাস ধরে প্যারা প্রদেশের ক্রীতদাস খোঁজার চাকরি ছেড়ে টরেস আমাজনের অববাহিকায় নেমেছিলো আর পেরু রাজ্যে ঢুকেছিলো। বনের মধ্যেই ছড়ানো অপর্যাপ্ত খাদ্য, এক পয়সাও খরচ নেই। কয়েকটা রেইস খরচ করলেই তামাক জোটানো যায়, ওটা সে গ্রামের মিশন স্টেশনেই কেনে। এছাড়া আর একটা জিনিস ওর চাই, তা হলো সুরা। সামান্যতেই টরেস খুশি।

কাগজটা বাক্সে ঢুকিয়ে টরেস শব্দ করেই ডালাটা শক্ত করে বন্ধ করলো, তারপর জামার পকেটে না ঢুকিয়ে আরো সাবধানে হবে বলে যে গাছের নিচে ও বসেছিলো তার গুঁড়ির একটা কোটরে ঢুকিয়ে রাখলো। সামান্য এই কাজটার জন্যে ওকে অনেক মূল্যই হয়তো দিতে হতো, পরের ঘটনাটাই তার প্রমাণ।

দারুণ গরম পড়েছে। বাতাসও যেন অসহ্য। কাছের গ্রামটায় গির্জায় একটা ঘড়ি থাকলে নিশ্চয়ই বেলা দুটো বাজতো; বাতাসে ভেসে সেই শব্দও নিশ্চয়ই ওর কানে ভেসে আসতো, কারণ টরেস গ্রাম থেকে মাইল দু'য়েকের বেশি দূরে নেই। তবে সময় সম্বন্ধে ওর মাথা-ব্যথা নেই—মাথার ওপর সূর্যের অবস্থান দেখেই সময়টা মোটামুটি ও ঠিক করে নেয়। ইচ্ছে হলেই প্রাতরাশ বা দুপুরের খাওয়া সেরে নেয়, ঘুম পেলে ঘুমিয়েও নেয়, সম্পূর্ণ মর্জির ব্যাপার। সারা সকাল হাঁটার ফলে ক্ষিধে পাওয়ায় কিছু খেয়েও নিয়েছে ও, ইচ্ছে হলো একটু ঘুমিয়ে

নেয়। ঘণ্টা দুই তিন একটু গড়িয়ে নিতে পারলে হাঁটার ক্ষমতাও ফিরে আসবে এই ভেবে ও একটা লোহা গাছের তলায় ঘাসের ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো।

টরেস হলো সেই জাতের মানুষ ঘুমিয়ে পড়তে হলে যাদের কিছু ভূমিকার দরকার। ওর অভ্যাস ছিলো ঘুমোনার আগে কয়েক ফোঁটা কড়া মদ গেলা আর তারপর একটা পাইপ ধরিয়ে ধূমপান। ওর ধারণা সুরা মস্তিষ্ক কোষকে উত্তেজিত করার সঙ্গে সঙ্গে তামাকের ধোঁয়া ভাবা-বেশটা চমৎকার সুখকর করে তোলে।

পাশে ঝোলানো ছোট্ট ফ্লাস্কটা বের করে টরেস মুখে টেকাতে চাইলো; ফ্লাস্কটায় পেরুর 'চিকা' নামের সুরা ভরা, উত্তর আমাজনে যার নাম 'কেসুমা'। এগুলো বানানো হয় এক মিষ্টি গাছের মূল গেঁজিয়ে। টরেস এর মধ্যে কিছু স্থানীয় 'টাফিয়া' সুরাও মিশিয়ে নিয়েছে।

এক চুমুক দিয়েই বিরক্ত হয়ে টরেস দেখলো ফ্লাস্কটা প্রায় শূন্য।

'হুঁ' আরো খানিকটা না জোটালে চলছে না,' আপন মনেই বিড়-বিড় করলো টরেস। পকেট থেকে এবার একটা কাঠের পাইপ বের করে ব্রাজিলের কড়া আর তেতো খানিকটা তামাক পাতা ঠেসে নিলো টরেস। পাতাগুলো এক রকম লতাগাছের পাতা, এই পাতা চালু করার মূলে ফ্রান্সের 'নিকো'। সারা দুনিয়ায় ওই লোকটাই পাতাটাকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

অবশ্য ওই দেশী তামাকের সঙ্গে আজকের তামাকের কোন তুলনা হয় না, তাছাড়া টরেস অন্যদের তুলনায় সহজেই তুষ্ট হয় বলেই বোধ হয় দেশলাই জ্বালিয়ে ও পিঁপড়ের লালায় তৈরী পাইপের মুখের পদার্থটা ধরিয়ে নিলো। পাইপটা ধরে উঠতেই গোটা বারো সুখটান দিলো টরেস, তারপর ঘুমে ওর চোখ বুঁজে আসতেই পাইপটা হাত থেকে আলগা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

॥ দুই ॥ লুটেরা আর লুণ্ঠিত

প্রায় আধ ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলো টরেস। আচমকা গাছপালার মধ্যে কিছু শব্দ জেগে উঠলো—হালকা পদশব্দ, কোন মানুষ যেন নিঃশব্দে পদসঞ্চারে খালি পায়ে হেঁটে আসছে। উত্তেজনাপ্রিয় মানুষটার যদি চোখ খোলা থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই সন্দেহজনক কিছুর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলার চেষ্টা করতো। কিন্তু জেগে ছিলো না বলেই আগন্তুক নিঃশব্দে গাছটার হাত দশেক দূরে এসে দাঁড়ালো।

প্রাণীটা কোন মানুষ নয়, একটা 'গুয়ারিবা' জাতের বাঁদর।

উত্তর আমাজনের জঙ্গলে যে সব পাকানো ল্যাজওয়ালা বাঁদর দেখা যায়, যেমন, সুন্দর জাতের 'সাহুই', শিঙেল বাঁদর, ধূসর লেঙ্গুর, মুখোশ-পরা বাঁদর—এগুলোর মধ্যে গুয়ারিবা বাঁদরগুলোই একটু ক্ষ্যাপাটে ধরণের। জন্তুটা মিশুকে, হিংস্র নয়। লালমুখো হিংস্র বাঁদরের চেয়ে এরা সভ্য, দল বেঁধেই থাকতে চায়। গুয়ারিবা, ঘুমন্ত মানুষ দেখলে একটু তামাশা না করেও পারে না।

বাঁদরগুলোর ব্রাজিলি নাম 'বারবাদো'। এগুলো আকারে বেশ বড়োই হয়। নমনীয় অথচ বলিষ্ঠ শরীরের জন্যে এগুলোকে বেশ শক্তি-শালীই বলা চলে।

সাবধানে পা টিপে টিপে জন্তুটা এগিয়ে এলো। ঘন ঘন ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বারবার চারদিকে তাকালো। বাঁদরগুলোর লম্বা ল্যাজও আছে যা দিয়ে চকিতে শত্রুকে জড়িয়ে ধরতে পারে জন্তুগুলো।

হাতে একটা মোটা কাঠের টুকরো দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এলো বাঁদরটা। অস্ত্রটা সাংঘাতিক। ঘুমন্ত মানুষটা নড়ছে না দেখে সাহসে ভর করেই ওটা আরও এগিয়ে এসে তিন-চার পা তফাতে থেমে পড়লো।

বাঁদরটার লোমে ঢাকা মুখটায় যেন অদ্ভুত এক জান্তব হাসি ফুটে উঠলো। সাদা ঝকঝকে কতকগুলো ধারালো দাঁতের সারি বেরিয়ে পড়লো।

টরেসকে দেখে বাঁদরটার মনে যে একটুও বন্ধুভাব জাগেনি তা ঠিক। আর তাছাড়া গ্রামের প্রান্তের জঙ্গলের এই মানুষগুলোর ওপর গুয়ারিবার রাগের বিশেষ কারণও হয়তো ছিলো।

আসলে ইণ্ডিয়ানরা অন্য জীবের চেয়ে বাঁদরের প্রতিই বেশি রকম উৎসাহী। অবশ্য শিকার করার চেয়ে ওর মাংস খেতেই ওরা বেশি তৎপর। গুয়ারিবাটা প্রাকৃতিক নিয়মে শাকপাতা ভোজী হলেও খুব সম্ভব অসহায় মানুষটাকে পেয়ে বরাবরের দৃশ্যটা পাল্টে দিতেই চাইছিলো। ওর মনোভাবটা বোধ হয় 'শত্রুকে খতম করাই ভালো', গোছের।

কয়েক মিনিট একাগ্র চিত্তে দেখার পর সে গাছটার চারপাশে একবার ঘুরে নিলো। তারপর পা টিপে টিপে ক্রমেই কাছে এগিয়ে এলো। সাংঘাতিক একটা হিংস্র আক্রোশের ছায়াই ওর মুখে ফুটে উঠলো। সত্যিই টরেসের প্রাণ ওই মুহূর্তে একটা সরু সুতোর ওপরেই ঝুলছিলো সন্দেহ নেই।

বাঁদরটা গাছের একেবারে কাছে, আরও কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর ঘুমন্ত শত্রুর মাথায় আঘাত করার জন্যে কাঠের টুকরোটা উঁচুতে তুলতে গেলো। কিন্তু টরেস যে চুরুটের বাক্সটা গাছের গুঁড়ির কোটরে রেখেছিলো দেখা গেলো তাই ওর জীবন বাঁচিয়ে দিলো।

বনের আকাশ-ছোঁয়া গাছগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ একফালি পড়ন্তরোদ এসে বাক্সটার ধাতব ঢাকনায় পড়ে আয়নার মতোই ছিটকে গেলো। আর তার ফলেই বাঁদরামি আর কাকে বলে, জন্তুটার নজর পড়লো বাক্সটার ওপর। থমকে দাঁড়িয়েই ও বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে দুএক পা পিছিয়ে ওটা চোখের কাছে এনে আয়নার মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। বাক্সটার মধ্যের সেই সোনার টাকাগুলোর ঠুনঠুন

শব্দে জন্তুটা আরও মজা পেয়ে গেলো। ঠিক যেন বাচ্চার হাতের একটা ঝুমঝুমি। হঠাৎ বাক্সটা মুখে ঢুকিয়ে কামড় লাগালো বাঁদরটা কিন্তু শক্ত ধাতুতে দাঁত বসাতে পারলো না। বাক্সটা আরও জোরে হাতে চেপে ধরতেই অন্য হাতের কাঠের টুকরোটা হাত থেকে পড়ে কয়েকটা শুকনো ডাল সশব্দে ভেঙে গেলো।

আর ঠিক তাতেই ঘুম ভেঙে গেলো টরেসের। সারা জীবনের সতর্ক অভিজ্ঞতার ফলেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো টরেস।

কি রকম শত্রু ওর সামনে সেটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে এক মুহূর্তও লাগলো না ওর।

'একটা গুয়ারিবা!' ও চেঁচিয়ে উঠলো।

এক মুহূর্তের মধ্যেই ম্যানচেট্টাটা হাতে নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায় টরেস।

বাঁদরটাও ভয় পেয়ে এক লাফে পিছিয়ে ডিগবাজি খেয়ে গাছের তলা দিয়ে ছুটলো।

'শয়তান কোথাকার! প্রায় খতম করেছিলো!' আঁতকে উঠলো টরেস।

প্রায় বিশ পা দূরে দাঁড়িয়ে বাঁদরটাকে মুখ ভ্যাঙচাতে দেখেই চমকে গেলো টরেস। কি সর্বনাশ! বাঁদরটার হাতে ওর সেই বাক্সটা!

'ব্যাটা ডাকাত!' চেঁচিয়ে উঠলো টরেস, 'হায় হায় মারা গেলাম দেখছি। আমার বাক্স হতচ্ছাড়া চুরি করেছে!'

বাক্সটার মধ্যে যে ওর শেষ সম্বল টাকা কড়ি আছে সে কথা একবারও মনে পড়লো না টরেসের ওর হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠলো দামী কাগজখানার কথা ভেবেই। ওটা গেলে সে ক্ষতি আর কিছুতেই পূরণ হবার নয়—ওর সব আশা ভরসাই ওই কাগজখানা।

পাগলের মতোই সব ভুলে বাক্সটা উদ্ধার করার তাগিদে বাঁদরটাকে তাড়া করে ছুটলো টরেস।

ওই রকম ছটফটে জীবের পেছনে ছোটা যে চাট্টিখানি কথা নয়

টরেস যে তা জানতো না তা নয়—মাটির ওপর বা গাছের ডালে যেখানেই হোক বাঁদরটার বিদ্যুৎগতির কাছে ও অসহায়। একমাত্র বন্দুক দিয়ে ওটাকে পেড়ে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় নেই, কিন্তু টরেসের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। ওর ম্যানচেট্টো বা এনকাড়া একেবারে কাছে গিয়ে ব্যবহার না করতে পারলে একেবারে অকেজো।

টরেস বুঝলো বাঁদরটাকে অচমকা না ধরতে পারলে ওটার নাগাল মেলা একেবারেই অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত তাই কৌশলেই জন্তুটাকে হাত করার চেষ্টা সুরু করলো ও। মাঝে মাঝে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে বা কোন গাছের গুঁড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে বাঁদরটাকে কাছে আসতে প্ররোচনা দিতে চাইলো টরেস। এ ছাড়া আর কিই বা করার আছে ? কিন্তু তাতেও ফল হলো না, বাঁদরটাও টরেসকে না দেখা পর্যন্ত নড়লো না।

'চুলোয় যাক হতভাগা বাঁদর', খিঁচিয়ে উঠলো টরেস, 'এভাবে চললে হতভাগা আমাকে আবার ব্রাজিলের সীমান্তে হাজির করবে। আঃ হতভাগা শুধু যদি বাক্সটা ফিরিয়ে দেয়। হতচ্ছাড়া টাকার শব্দে মাতোয়ারা হয়ে আছে। যদি তোকে একবার ধরতে পারতাম,' রাগে গরগর করতে থাকে টরেস।

হঠাৎ দারুণ রাগ হলো টরেসের। দাঁত খিঁচিয়ে আবারও তাড়া সুরু করলো ও। ছুটতে গিয়ে গাছের ঝুরি আর শিকড়ে পা আটকে পড়তেই বাঁদরটাও লাফিয়ে গাছে উঠে পড়লো। পাগলের মতোই চীৎকার করতে লাগলো টরেস, 'হতভাগা চোর ! আয়, আয় একবার নিচে নেমে আয়।'

ক্রমশঃ দম বন্ধ হবার জোগাড় হলো টরেসের। আর ছুটবার ক্ষমতা নেই। বাধ্য হয়েই থেমে পড়লো ও, 'উঃ ! এমন বিপদে আর পড়িনি ! গোলামগুলোও এমন বিপদে কোনদিন ফেলেনি আমাকে ! ওরে হতভাগা বনমানুষ, যতোদূর যাবি আমিও তোর পেছনে যাবো, ভেবেছিস কি ? যতক্ষণ পা'য়ে শক্তি থাকবে তোর পেছনে ছুটবো।'

বাঁদরটাও ততক্ষণে টরেসকে থামতে দেখে থেমে পড়েছে। আর ক্ষণেক্ষণেই বাক্সটা কানের কাছে নিয়ে বাজাতে চাইছে।

রাগে অন্ধ হয়ে পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগলো টরেস। একটা অবোলা জীবের কাছে এভাবে হেরে যাওয়ার চিন্তাটাই মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিলো ওর। হঠাৎই টরেসের মাথায় এলো আর একটু পরেই রাতের অন্ধকার বন জুড়ে যখন নেমে আসবে তখন ডাকাত বাঁদরটা সরে পড়বে। এই লুকোচুরি খেলায় ইতিমধ্যেই নদীর কূল থেকে ও অনেক দূরেই সরে এসেছে, সেখানে পথ খুঁজে পৌছনো দারুণ কঠিনই হবে।

টরেস ইতস্তত করতে লাগলো; মাথা ঠাণ্ডা করে শেষপর্যন্ত ও শেষবারের মত জানোয়ারটাকে অভিশাপ দিয়ে বাক্সটা ফিরে পাওয়ার সব আশা যখন জলাঞ্জলি দিতে চাইলো তখনই আর একবার চেষ্টার ইচ্ছেটা জেগে উঠলো। ওর মনে পড়লো সেই কাগজখানার কথা—ওর মধ্যেই যে ওর আশা-ভরসা জড়িয়ে আছে।

টরেস একটু এগোতেই বাঁদরটাও তড়াক করে একটা গাছে উঠে ডালে বসে দোল খেতে বাক্সটা কানের কাছে বাজাতে লাগলো।

আবার কিছু পাথর ছুঁড়লো টরেস। কিন্তু বাঁদরটার গায়ে লাগলো না। টরেস ভাবছিলো তাড়া খেলে বাক্সটি যদি বাঁদরটার হাত থেকে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত একরকম চরম হতাশ হয়েই এই অসম্ভব লুকোচুরি খেলা বন্ধ করে টরেস আমাজনের দিকে যাওয়ার চিন্তা সুরু করতেই আচমকা ওর কানে ভেসে এলো কারও কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ, মানুষেরই কণ্ঠস্বর। ওর চেয়ে প্রায় বিশ পা দূরেই কেউ কথা বলছিলো।

টরেসের প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়া। হাঁফাতে হাঁফাতে কানখাড়া করে ও অপেক্ষা করতেই প্রচণ্ড একটা বন্দুক নির্ঘোষে সারা বনটাই যেন কেঁপে উঠলো।

একটা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ আহত মুমূর্ষু বাঁদরটা টরেসের সেই বাক্সটা মুঠোয় নিয়েই দরাম করে মাটিতে ঠিকরে পড়লো।

'আরে গুলিটা দেখছি ঠিক সময় মতোই কেউ ছুঁড়েছে!' আপনমনেই বলে উঠলো টরেস।

পরক্ষণই কারো নজরে পড়ার ভয় ছেড়েই টরেস ঝোপের বাইরে এসে দাঁড়াতেই গাছের আড়াল থেকে তুজন যুবক বেরিয়ে এলো।

তুজনেই ব্রাজিল বংশীয়, পোশাক শিকারই সুলভ, চামড়ার জুতো, বড়ো কানাওয়ালা টুপি, ভেতরে একটা আঁটোসাঁটো জামা কোমরে জড়ানো, আলখেল্লার চেয়ে সুবিধা জনকই হবে। তুজনের হাবভাবে আর গাত্রবর্ণে পর্তুগীজ বংশীয় বলেই মনে হয়।

তুজনেরই হাতে স্পেন দেশে তৈরী লম্বা বন্দুক, অনেকটা আরব দেশীয় সূক্ষ্ম দূর পাল্লার বন্দুকের মতোই। উত্তর আমাজনের বনের অধিবাসীরাই এগুলো ব্যবহার করে। বন্দুকটার ক্ষমতা এইমাত্রই দেখেছে টরেস, প্রায় আশি পা দূর থেকেই জানোয়ারটার মাথায় সরাসরি গুলি বিঁধেছে।

যুবক তুজনের কাছে বন্দুক ছাড়াও কোমরবন্ধে ঝুলছে তুটো ছোরা। ব্রাজিলে এগুলোর নাম 'ফোকা'। এগুলো শিকারিরা ছোট জাতের চিতাবাঘ আর জঙ্গলের অন্যান্য প্রচুর জন্তুর আক্রমণ ঠেকাতে ব্যবহার করে।

টরেসের পক্ষে সাক্ষাৎটা তেমন ভয়ের বলে মনে হলো না বলেই সে সঙ্গে সঙ্গেই গুয়ারিবাটার মৃতদেহের দিকে ছুটলো।

যুবক তুজনও সেই দিকেই আসছিলো টরেসের চেয়ে ওরা বাঁদরটার কাছে থাকায় পরমুহূর্তেই ওরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো।

টরেস ইতিমধ্যে তার মানসিক স্থৈর্য আবার ফিরে পেয়েছে।

'অজস্র ধন্যবাদ, ভদ্রমহোদয়রা', মাথার টুপি তুলে অভিবাদন জানালো টরেস, 'বাঁদরটাকে মেরে আপনারা আমার দারুণ উপকার করেছেন।'

শিকারী তুজন অবশ্য ব্যাপারটা না বুঝে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

টরেস তু-এক কথায় ব্যাপারটা ওদের বোঝাতে চাইলো।

'আপনারা বোধহয় একটা বাঁদর মেরেছেন বলেই ভেবে নিয়েছেন'। আসলে একটা লুটেরাকে খতম করেছেন আপনারা।'

'আপনার কাজে লাগলেও ব্যাপারটা কিন্তু হঠাৎই হয়ে গেছে', দুজনের মধ্যে অল্প-বয়স্ক যুবকটিই কথা বলে, 'তাহলেও আপনার কাজে লেগেছি বলে খুশি হলাম।'

বাঁদরটার শক্ত মুঠি থেকে বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে সে বলে, 'এটাই তাহলে আপনার জিনিস, স্যর ?'

'হ্যাঁ, ওটাই', হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিতে নিতে একটা দারুণ স্বস্তির নিঃশ্বাস না ফেলে পারলো না। 'আপনাদের মধ্যে কাকে যে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারছি না, যা উপকার করলেন।'

'এ হলো আমার বন্ধু ম্যানোয়েল, ব্রাজিল সৈন্যবাহিনীর সহকারী সার্জন', কম বয়সী যুবকটি জবাব দিলো।

'বাঁদরটাকে আমি গুলি করলেও, বেনিতো, তুমিই কিন্তু ওটাকে দেখিয়ে দিয়েছো,' ম্যানোয়েল বলে।

'তাহলে, স্যর,' টরেস বলে, 'আপনাদের দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ মিঃ ম্যানোয়েল, আর আপনাকে মিঃ।'

'আমার নাম বেনিতো গ্যারাল, ম্যানোয়েল বলে।

নামটা শুনেই বনচর কাপ্তেনের নিজেকে লাফিয়ে ওঠার হাত থেকে নিবৃত্ত করতে দারুণ একটি চেষ্টা করতে হলো। যুবকটি অবশ্য কিছু লক্ষ্য না করেই বলে চলে, 'আমার বাবা জোয়াম গ্যারালের খামার এখান থেকে মাইল তিনেক দূরেই। আপনি যদি ইচ্ছে করেন, মিঃ ?

'আমার নাম টরেস', কোনরকম উত্তর দেয় বনচর-কাপ্তেন।

'আপনি যদি আমাদের সঙ্গে সেখানে আসেন আপনার আতিথ্যের কোনরকম ত্রুটি হবে না মিঃ টরেস।'

'সেটা ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব নয়', টরেস বলে আচমকা এই দেখা সাক্ষাৎএর চমকটা তার বোধ হয় কাটেনি তখনও। 'আমার মনে হয় এখন আপনাদের আতিথ্য নিতে পারবো না। এই ঘটনায় বেশ সময় নষ্ট হয়ে গেছে। আমাকে এখনই আমাজনে ফিরে যেতে হবে, তারপর সেখান থেকে যেতে প্যারায়।'

'তবে তাই হোক, মিঃ টরেস,' বেনিতো উত্তর দিলো, 'মনে হয় বেড়াতে বেড়াতে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কারণ আর এক মাসের মধ্যেই বাবা সকলকে নিয়ে আপনার পথেই যাবেন।'

'আহা তাই নাকি ?' গলাটা তীব্র শোনালো টরেসের, 'আপনার বাবা কি আবার ব্রাজিল সীমান্ত পার হবার কথা ভাবছেন নাকি ?

'হ্যাঁ, কয়েক মাস বেড়াবার জন্যেই। তাঁর মত করাতে পারবো বলেই মনে হয়, তাই না ম্যানোয়েল ?' বেনিতে বন্ধুর দিকে তাকায়।

'ম্যানোয়েল সায় জানালো কথাটায়।

'তাহলে নমস্কার', টরেস উত্তর দিলো, মনে হয় পথেই আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। তবে আপনাদের এখনকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ, সত্যিই আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

কথা শেষ করে ধন্যবাদ জানাতেই ওরাও প্রত্যুত্তর জানিয়ে খামার বাড়ির দিকে দুজনে রওয়ানা হয়ে গেলো।

এক দৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো টরেস। ক্রমে ওরা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতেই ও আপনমনে ভারী গলায় বলে উঠলো, হুঁ, আবার সীমান্ত পার হতে চায়। করে দেখুক একবার। তবুও আমার খপ্পরেই ওকে থাকতে হবে। ভ্রমণ তোমার সুখের হোক জোয়াম গ্যারাল।'

কথাটা শেষ করেই বনচর-কাপ্তেন দক্ষিণ-মুখো হয়ে নদীর বাঁ কূলের কাছে পৌঁছবার কাছের রাস্তা ধরে চলতে চলতে গহন অরণ্যে হারিয়ে গেলো।

॥ তিন ॥ গ্যারাল পরিবার

ইকুইটোস গ্রামটা ম্যারানন নদীর বাঁ তীরে প্রায় ৭৪ মধ্যরেখার কাছাকাছি, বিশাল ম্যারানন নদী ওখান থেকেই বয়ে চলেছে। নদীটির অববাহিকা পেরু রাজ্যকে ইকোয়েডর প্রজাতন্ত্র থেকে আলাদা করে রেখেছে। জায়গাটা ব্রাজিল সীমান্তের পশ্চিম থেকে প্রায় পঞ্চান্ন লীগ দূরে।

ইকুইটোস গ্রামটিতে অন্যান্য নানা গ্রামের মতোই কুটির আর ছোটো ছোটো নদী আর জলাশয়ের অভাব নেই। এককালে ধর্মপ্রচারকদেরও যাতায়াত ছিলো এসব জায়গায়। আঠারো শতকের গোড়ায় জনসংখ্যার একটা মোটা অংশ ইকুইটো ইণ্ডিয়ানরা নদী থেকে কিছু দূরে দেশের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু এক সময় নদী নালা জলাশয় আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতে শুকিয়ে গেলে সকলে দল বেঁধে ম্যারানন নদীর বাঁ তীরে এসে ডেরা বাঁধে। এর ফলে জাতটার মধ্যেও বেশ একটা পরিবর্তন ঘটে স্থানীয় ইণ্ডিয়ান, টিকুনা বা ওমাগুয়া আর কিছু স্পেনীয় মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে। আজকের ইকুইটোরা প্রায় সকালই বর্ণসংকর।

নদী থেকে প্রায় ষাট ফুট দূরেই ছবির মতো গ্রামটি। বাড়ি ঘর বলতে গোটা ষাটেক ভাঙা চোরা কুটির, বিচালি ঢাকা ঘরের চাল। মোটা মোটা কিছু কাঠ আড়াআড়িভাবে সাজিয়ে একটা সিঁড়ি গ্রাম পর্যন্ত ছড়ানো। ওপরের অংশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়বে কিছুটা নিরাপদ মতো একটা জায়গা, নানা ঝোপঝাড়, অদ্ভুত কিছু উদ্ভিদ পরস্পর জড়াজড়ি করে উঠেছে। এখানে ওখানে ছড়ানো আর জেগে ওঠা কিছু তাল আর কলাগাছের চূড়ো।

কাহিনী সুরুর সময়টাতে ইকুইটো ইণ্ডিয়ানেরা প্রায় নগ্ন অবস্থাতেই থাকতো। শুধু স্পেনীয় আর বর্ণসংকরেরাই পোশাক পরতো। প্রায়

সকলেই গ্রামটাতে নিরানন্দ জীবনই কাটাতো, মেলামেশা বড় একটা ঘটতো না। ক্বচিত কখনও পরস্পরের দেখা শোনা হতো ভগ্নদশাপ্রাপ্ত গির্জা হিসেবে ব্যবহার করা কুটিরটায়।

কিন্তু ইকুইটো গ্রামের এই জীবন যদি উত্তর আমাজনের অন্যান্য ছোটো গ্রামগুলোর মতোই আদিমতায় ভরা হয় তাহলে এর চেয়ে এক লীগ দূরে নদীর তীর ধরে গেলেই ওই তীরের ওপরেই প্রাচুর্যভরা সুখী জীবনধারনের সব ব্যবস্থাই লোকের নজরে পড়তো।

এটাই জোয়াম গ্যারালের খামার। ওখানেই আমাদের পূর্ব পরিচিত সেই দুজন বন্ধু বনচর কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ফিরে এলো।

ওখানেই নদীর একটা বাঁকের মুখে ৫০০ ফুট চওড়া 'ন্যাজে' নদীর সংযোগস্থলটায় স্থাপন করা হয়েছিলো বহু বছরের এই খামার আর বাস্তু ভিটা, এদেশের ভাষায় যার নাম 'ফ্যাজেনডা' এখানেই ছাব্বিশ বছর আগে ১৮২৬ সালে এই কাহিনী শুরুর আগে জোয়াম গ্যারালকে ফ্যাজেনডার মালিক সাদরে গ্রহণ করেছিলো?

এই পর্তুগীজ লোকটির নাম ছিলো ম্যাগালহাই। তার কাজ ছিলো গাছ কাটা। নদীর কূলে আধ মাইল ধরে ছিলো তার সম্পত্তি।

ওখানেই প্রাচীন পর্তুগীজদের মতোই অতিথি বৎসল ম্যাগালহাই তার চেয়ে ইয়াকুটাইকে নিয়ে বাস করতো। মা মারা যাওয়ার পর মেয়েই সংসারের সব দায় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলো। ম্যাগালহাই নিজে ছিলো দারুণ কর্মঠ, অবশ্য সে জানতো না। ওর কিছু ক্রীতদাস আর ধার করা জন কয়েক ইণ্ডিয়ানদের কাজ করাবার কায়দা জানলেও ব্যবসার ফিকির বাজি ও বিশেষ জানতো না। ইকুইটোর ওই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিও তাই হচ্ছিলো না।

ঠিক ওই সময়েই বাইশ বছরের যুবক জোয়াম গ্যারাল ম্যাগালহাইয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। প্রায় অর্ধমৃত আর কপর্দকশূন্য অবস্থায় সে এসে পৌঁছেছিলো। ম্যাগালহাই তাকে কাছের একটা জঙ্গলের মধ্যে অর্ধমৃত অবস্থাতে দেখতে পায়। পর্তুগীজ মানুষটির মনটা উদার হওয়ায়

অচেনা মানুষটিকে সে কোথা থেকে এসেছে প্রশ্ন না করে বরং তার প্রয়োজনটুকু জেনে নিলো। পরিশ্রমে কাতর হওয়া সত্ত্বেও জোয়াম গ্যারালের অভিজাত আর মর্যাদা ভরা ভঙ্গী ওকে দারুণ আকর্ষণ করে বসলো। জোয়াম গ্যারালকে সাদরে গ্রহণ করে কয়েকদিন শুশ্রূষা করলেও শেষ পর্যন্ত ওর আতিথেয়তা সারা জীবনেরই হয়ে দাঁড়ায়।

এই ভাবেই জোয়াম গ্যারাল ইকুইটোর খামারে এসে যোগ দিলো।

ব্রাজিল বংশের ছেলে জোয়াম গ্যারালের পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পদ ছিলো না। নানা রকম ঝঞ্ঝাটে সে আর ফিরবে না মনে করেই দেশ ছাড়লো। আশ্রয়দাতার কাছে নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী উত্থাপনের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিলো জোয়াম গ্যারাল। সত্যিই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যতনটা ততটাই মিথ্যার প্রলেপ। ওর চাইবার মতো এখন শুধু নতুন জীবন আর নতুন কিছু কাজ। ও শিক্ষিত আর বুদ্ধিরও কমতি নেই। ওর কথা-বার্তায় অকথিত এমন কিছু একটা ছিলো যাতে সহজেই যে কেউ বুঝতে পারে সে নির্ভেজাল সৎ আর চরিত্রবান। ম্যাগালহাই মুগ্ধ হয়ে ওকে ওর খামারে যোগ দিতে ডেকে ওর অভাব পূরণের আশ্বাস দিলো।

একটুও ইতস্ততঃ না করেই জোয়াম গ্যারাল প্রস্তাবটা গ্রহণ করে ফেললো। জোয়ামের উদ্দেশ্য ছিলো কোন রবার বাগান বা 'সেরিঙ্গালে' যোগ দেওয়া—তখনকার দিনে একজন দক্ষ লোক দিনে পাঁচ বা ছ' পিয়াস্ত্রা রোজগার করতে পারতো আর ভাগ্য ভালো বলে ওস্তাদ হয়ে উঠতেও পারতো। কিন্তু ম্যাগালহাই জানালো মাইনে ভালো হলেও ওসব জায়গায় শুধু ফসল কাটার সময়েই কাজ মেলে, ওর মতো যুবকের পক্ষে সেটা উপযুক্ত নয়।

জোয়াম গ্যারালও তা বুঝেই ওরই 'ফ্যাজেনডায়' সঙ্গে সঙ্গেই কাজে লাগলো। ম্যাগালহাইও নিজের সদয় ব্যবহারের ফল হাতে হাতে পেয়ে গেলো ওর যে কাঠের ব্যবসা আমাজন থেকে প্যারা অবধি ছিলো, জোয়াম গ্যারালের চেষ্টায় তা আরো জড়িয়ে পড়লো। বাড়িটাও সুন্দর করে তুলে একটা তলও বাড়িয়ে নেওয়া হলো—সুন্দর সুন্দর লজ্জাবতী

লতা, ডুমুর, পলিনিয়ার মোটা গুঁড়িওয়ালা তরমুজ পাতায় চারিদিক ঢাকা পড়লো। একটু তফাতেই বড়ো বড়ো ঝোপের আড়ালে ঘেরা জায়গাটায় ফ্যাজেনডার শ্রমিকদের বাস—সেখান থাকে চাকর-বাকর কালো ক্রীতদাস আর ইণ্ডিয়ানরা। গাছে ঘেরা বাড়িটাই কেবল নদীর তীর থেকে নজর আসে।

হ্রদের ধারে অনেক পরিশ্রমে পরিষ্কার করা জায়গাটার মাঝে চমৎকার গোচারণের জায়গা। গরু বাছুরও কম নেই—উর্ব্বর এদেশে এটা প্রচুর লাভের ব্যাপার। কিছু কফির বাগান সাফ করে তৈরী করা হলো আখের চাষ। রসে ভরা আখ পিষে রস নিঙরে গুড়, টাফিয়া সুরা আর 'রাম' বানাতে একটা কারখানাও দরকার হয়ে পড়লো। মোট কথা জোয়াম গ্যারালের উপস্থিতির দশ বছরের মধ্যেই ইকুইটার খামার উত্তর আমাজনের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী খামার হয়ে দাঁড়ালো।

পর্তুগীজ মানুষটি খুব বেশিদিন জোয়াম গ্যারালের কাছে ওর কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে দেরী করলো না। ওর গুণের কদর করতেই গোড়া থেকেই ম্যাগালহাই জোয়াম গ্যারালকে লাভের অর্দ্ধেক বখরা দিয়ে চার বছর পরেই ব্যবসার অর্দ্ধেক মালিকানাও দিয়ে দিলো।

কিন্তু জোয়াম গ্যারেলের ভাগ্যে আরো অনেক কিছুই ছিলো। ম্যাগালহাইয়ের মেয়ে ইয়াকুইটা ওই স্বল্পবাক, হৃদয়বান নম্র তরুণের মধ্যে ওর বাবার ছায়াই যেন দেখে ফেললো। জোয়ামকে ভালোবেসে ফেললো ইয়াকুইটা। জোয়াম গ্যারালেরও সুন্দরী ইয়াকুইটাকে ভালো-বাসতে দেরী হলো না—কিন্তু ওর আত্মাভিমানের জন্যেই খুব সম্ভব ও বিয়ের কোন প্রস্তাব দিতে চাইলো না।

কিন্তু একটা মারাত্মক ঘটনাই সব কিছু সমাধান করে দিলো।

কাজ দেখতে দেখতে ম্যাগালহাই আচমকা একদিন একটা পড়ন্ত গাছের আঘাতে সাংঘাতিক আহত হয়ে পড়লো। বাড়িতে নিয়ে আসতেই নিজের অন্তিম অবস্থা বুঝেই ম্যাগালহাই ক্রন্দনরতা মেয়ের হাত জোয়াম

গ্যারালের হাতে দিয়ে তাকে শপথ করিয়ে নিলো ইয়াকুইটাকে বিয়ে করে সে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে।

'তুমিই আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছো', ম্যাগালহাই বললো, 'এই বিয়ের মধ্য দিয়ে আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় না করতে পারলে মরেও আমি শান্তি পাবো না, জোয়াম।'

'বিয়ে না করেও, একজন কর্মচারী, ভাই বা রক্ষক হয়েও আপনার মেয়েকে আমি রক্ষা করতে পারি', জোয়াম গ্যারাল জানালো, 'আপনিই আমাকে সবকিছু দিয়েছেন—কিন্তু আমি হয়তো আপনার মেয়ের যোগ্য নই।'

বৃদ্ধ ম্যাগালহাই কোন কথাই শুনলো না। মৃত্যুর আর বেশি দেরী নেই বুঝেই যেন ও বারবার জোয়ামকে শপথ করতে অনুরোধ জানালো। আশীর্বাদ করার ক্ষমতাটুকুই শুধু ওর অবশিষ্ট ছিলো।

ঠিক ওই অবস্থায় পড়েই ১৮৪০ সালে সব কর্মীর প্রিয় জোয়াম গ্যারাল ইকুইটোর খামারের নতুন মালিক হয়ে দাঁড়ালো।

বিয়ের বছর খানেক পরেই ইয়াকুইটা স্বামীকে উপহার দিলো প্রথম সন্তান, একটি ছেলে আর পরের বছরেই এক মেয়ে। বেনিতো আর মিণা, বৃদ্ধ ম্যাগালহাইয়ের নাতি আর নাতনি, জোয়াম আর ইয়া-কুইটার উপযুক্ত সন্তান।

মেয়েটি হয়ে উঠলো অপরূপ সুন্দরী। ফ্যাজেন্ডার প্রাচুর্যেই সে বেড়ে উঠলো। মা আর বাবার শিক্ষায় গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রকৃতিক উজার করা সৌন্দর্যের মধ্যে শিক্ষা পেতে লাগলো মিণা। মানাও বা বেলেমের কন-ভেন্টে এর চেয়ে ভালো শিক্ষা হয়তো কেউ পায় না।

বেনিতোর ব্যাপার আলাদা। বাবার ইচ্ছায় ব্রাজিলের যে কোন বড়ো শহরের মতোই সুশিক্ষা পেলো সে। ছেলেকে না দেবার কিছুই ছিলো না জোয়ামের। খুবই আমুদে, বুদ্ধিমান আর গুণের অধিকারী বেনিতো। বারো বছর বয়সে প্যারার বেলেমে পাঠানো হলো তাকে। সেখানকার চমৎকার শিক্ষায় অল্প দিনেই বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ালো বেনিতো।

সাহিত্য, বিজ্ঞান আর কলা কোনটাই ওর অজানা রইলো না। ধনী বাপের স্ফূর্তিবাজ ছেলে না হয়ে সে হলো মানুষের মতোই মানুষ।

বেলেমে থাকার সময়েই বেনিতোর সঙ্গে পরিচয় হলো ম্যানোয়েল ভ্যালডেজের। বেনিতোর সহপাঠি, প্যারার কোন ব্যবসায়ীর ছেলে। দুবন্ধুর চারিত্রিক মিল আর স্বভাব বন্ধুত্বের পথে একটুও বাধা হলো না।

ম্যানোয়েল বেনিতোর চেয়ে এক বছরের বড়ো—জন্ম ১৮৩২ সালে। স্বামীর সামান্য সম্পত্তির অধিকারিনী বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে ম্যানোয়েল। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মহান চিকিৎসা বিদ্যা পড়তে লাগলো ও, ইচ্ছে সেনাদলে যোগ দেওয়া।

যে সময় ওকে ওর বন্ধু বেনিতোর সঙ্গে দেখা গেলো তখনও প্রথম পাঠ শেষ করে ছুটি কাটানোর ইচ্ছেতেই ফ্যাজেনডায় কয়েক মাস কাটাতে এসেছিলো। জোয়াম আর ইয়াকুইটা ম্যানোয়েলকে নিজেদের ছেলের মতোই কাছে টেনে নিলো। তবে বেনিতোকে ভাইয়ের মতো মনে করলেও মিণার প্রশ্ন ছিলো আলাদা—তার সঙ্গে ম্যানোয়েলের সম্পর্ক দাঁড়ালো একেবারে আলাদা, ভাইবোনের চেয়ে অনেক অন্তরঙ্গ।

১৮৫২ সাল। এ কাহিনী সুরুর আগে চার মাস কাটাতে এসেছিলো। জোয়াম আর ইয়াকুইটা ম্যানোয়েলকে নিজেদের ছেলের মতোই কাছে টেনে নিলো। তবে বেনিতোকে ভাইয়ের মতো মনে করলেও মিণার প্রশ্ন ছিলো আলাদা—তার সঙ্গে ম্যানোয়েলের সম্পর্ক দাঁড়ালো একেবারে আলাদা, ভাইবোনের চেয়ে অনেক অন্তরঙ্গ।

১৮৫২ সাল। এ কাহিনী সুরুর আগে চার মাস কেটে গেছে—জোয়াম গ্যারালের বয়স তখন আটচল্লিশ। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে গরম আর হাওয়ায় মানুষ বড়ো তাড়াতাড়িই বুড়ো হয়ে পড়লেও জোয়াম গ্যারাল ওর সংযম, পরিশ্রম আর সৎজীবন যাপনের মধ্য দিয়ে সব বাধাই কাটিয়ে উঠেছিলো। সামান্য পাক ধরেছিলো মাথার চুল আর মুখের এক গোছা দাড়ি। ব্রাজিল বংশজাত ব্যাবসায়ীদের চিরাচরিত

সততারই যেন প্রতিচ্ছবি জোয়াম গ্যারাল। মনে হয় বাইরের আপাত প্রশান্তির আড়ালে চাপা আছে অন্তরের আগুন।—

কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটা গভীর বিষাদ ব্যঞ্জনা বলিষ্ঠ সার্থক মানুষটিকে মাঝে মাঝে উতলা করে তোলে—ইয়াকুইটার কোমলতাও যা দূর করতে পারে না। সকলের সম্মানের পাত্র হয়ে আর সুখের পূর্ণ পাত্র হাতে পেয়েও মানুষটি যে কেন আরো স্ফূর্তিবাজ আর মিশুকে হতে পারলো না কে জানে। অন্যের মুখে সুখী, অথচ নিজে অন্তরে দুঃখী, সত্যিই বিচিত্র।

ব্যাপারটা কি কোন গোপন ব্যথারই পরিনতি? ওর স্ত্রীর কাছে সেটাই ছিলো এক সর্বক্ষণের চিন্তা।

ইয়াকুইটার বয়স এখন চুয়াল্লিশ। গ্রীষ্মপ্রধান এ জায়গায় মেয়েরা সহজেই বুড়িয়ে গেলেও সে অদ্ভুত কৌশলেই প্রকৃতির নির্মম হাতকে ঠেকাতে পেরেছিলো। প্রকৃতি ওর কিছুটা তীব্র, তবু ও সুন্দর আর পর্তুগীজ সুলভ সামান্য উদ্ধত বটে—মুখের মাধুর্য সেখানে এসে মিশেছে মনের উদারতার সঙ্গে।

বেনিতো আর মিণাও বাপ মায়ের ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধাবান। বেনিতোর বয়স এখন একুশ, চটপটে, দরদী আর সাহসী সে। ওর বন্ধু ম্যালেয়েলের সঙ্গে তফাত এই, সে বেশি রাশভারী আর চিন্তাশীল। ফ্যাজেন্ডার চেয়ে বেশ দূরে বেলেমে এক বছর কাটানোর পর বাবা, মা আর বোনকে আবার দেখার জন্যে আর পাকা শিকারী হয়ে উত্তর আমাজনের মানুষের অজানা রহস্য ঘেরা অরণ্য শিকারের ইচ্ছেটা বেনিতোকে উতলা করে তুললো।

মিণার বয়স কুড়ি। অপরূপা সে, স্বর্ণকেশী। সুনীল চোখদুটো যেন মনেরই প্রতিচ্ছবি। সবারই ভালোবাসার পাত্রী। ফ্যাজেন্ডার যে কোন কর্মচারীই নির্দ্বিধায় ওই কথাই বলতে চাইবে।

গ্যারাল পরিবারের ছবিটা কিন্তু ফ্যাজেন্ডার অসংখ্য কর্মীর পরিচয় ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। ষাট বছর বয়সী নিগ্রো রমণী সিবিল তাদের এক

জন। সে ক্রীতদাসী হলেও মালিকের উইল অনুযায়ী মুক্তি প্রাপ্তা। সে ছিলো ইয়াকুইটার ধাত্রী। পরিবারেরই একজন, মা ও মেয়ে, দু' জনেরই দাসী। স্ত্রীলোকটির সারা জীবনই অরণ্য ঘেরা এই নদী তীরের ক্ষেতটায় কেটেছে। ইকুইটোর ক্রীতদাসপ্রথার আদিম যুগে এসে এ গ্রাম ছেড়ে সে আর কোথাও যায়নি; এখানেই ওর বিয়ে হয় তারপর অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার পর একমাত্র ছেলেও মারা গেলে ম্যাগালহাইয়ের কাছেই থেকে যায় সে।

ওরই মতো মিণার কাজ করার জন্যে আর এক সাদা কালোর মিশ্রণ-জাত সুশ্রী হাসিখুশি প্রায় মিণার সমবয়সী আর ভক্ত মেয়ে ছিলো, মেয়েটির নাম লিনা। সরলা ওই মেয়েটাও পরিবারের একজন হয়ে অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছিলো।

দাসদাসীদের মধ্যে এছাড়াও ছিলো প্রায় শ' খানেক ফ্যাজেন্ডার শ্রমিক, ইণ্ডিয়ান আর শ'দুই কালো ক্রীতদাস। তাদের সন্তানেরা অবশ্য মুক্তই ছিলো। এ ব্যাপারে জোয়াম গ্যারাল ব্রাজিল সরকারের চেয়ে এগিয়ে ছিলো। এই ফ্যাজেন্ডায় অন্য জায়গার মতো কোন নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হতো না।

চার ॥ দ্বিধা

ম্যানোয়েল ওর বন্ধু বেনিতোর বোনের প্রেমে পড়ে গেলো। সেও তাই। দুজনেই দুজনের কাছে যেন অপরিহার্য হয়ে পড়লো।

মিণার সম্বন্ধে নিজের মনটাকে ঠিক করে নিয়েই ম্যানোয়েল বেনিতোর কাছে সব কথা খুলে বলে ফেললো।

বেনিতো সব শুনে বন্ধুকে বললো, 'ম্যানোয়েল, তুমি আমার হাতেই ছেড়ে দাও। মা'কে আগে জানাই, তার মত পেতে দেরী হবে না।'

আধ ঘণ্টা পরেই বেনিতো তাই করলো। অবশ্য ইয়াকুইটার কাছে এ রহস্যটা একটুও অজানা ছিলো না। মিনিট দশ পরেই বেনিতো বোনের কাছে এলো। বোনের মনটাকে জেনে নিতে ওর দেরী হলো না। মিণা শুধু ফিস ফিস করে বলে, 'আমি কি সুখী!'

জোয়াম গ্যারালের মত পেতে অবশ্য দেরী হবে না। ইয়াকুইটা বা ওর ছেলেমেয়েরা কথাটা যে তখনই তার কানে তুললো না তার একটা কারণ ছিলো। বিয়েটা কোথায় হবে?

গ্রামের সেই ভাঙা গির্জায়। নয়ই বা কেন? জোয়াম আর ইয়াকুইটা ইতিমধ্যেই বিয়েতে ইকুইটোর গির্জার পাদ্রী প্যাসানহার আশীর্বাদ পেয়ে গিয়েছিলো। আজকের মতো তখন ব্রাজিলে ধর্মীয় আর সাধারণ কাজকর্মে কোন সীমানা টানা ছিলো না। গির্জার পাদ্রী যা করতেন সাধারণ মানুষের তা করার ক্ষমতা ছিলো না।

জোয়াম গ্যারাল নিশ্চয়ই ইকুইটোতেই বিয়েটা খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে হোক তাই চাইতো যাতে ফ্যাজেনডার সব কর্মীই যোগ দিতে পারে। কিন্তু এটা হলে খুব বড়ো একটা বাধা ওকে হয়তো পেতে হতো।

মিণা ওর বাগদত্ত ম্যানোয়েলকে কিন্তু জানালো, 'ম্যানোয়েল, আমি কিন্তু এখানে বিয়েটা হোক চাই না বরং প্যারাতে হোক। মাদাম ভ্যালডেজ রুগ্না বলে ইকুইটোতে আসতে পারবেন না আর তাঁর ছেলের বউ হতে গেলে তার সঙ্গে আগে পরিচয় হবে না, তা হয় না। মা'রও সেই মত। বাবাকে তাই বেলেমে নিয়ে যেতে বলবো। তুমি কি বলো?'

ম্যানোয়েল কোন জবাব না দিয়ে প্রিয়তমার হাতে একটু চাপ দিলো—ওরও তো মনগত ইচ্ছে মা আসুক। বেনিতোও রাজি হলো, এখন শুধু জোয়াম গ্যারালের মত নেওয়া। আর এই জন্যেই তুই বন্ধু ইয়াকুইটাকে স্বামীর কাছে রেখে শিকারে বেরিয়েছিলো।

বিকেলে জোয়াম সবেমাত্র এসে বাঁশের একটা কেদারায় হাত পা ছড়িয়ে বসেছে ইয়াকুইটা এসে পাশে বসে পড়লো।

ম্যানোয়েল আর মিনার মন দেওয়া-নেওয়া ব্যাপারটা একটুও সমস্যা হবে না, আসল সমস্যা হলো ফ্যাজেনডা ছেড়ে যাওয়া।

আসলে তরুণ জোয়াম গ্যারাল এদেশে আসার পর একদিনের জন্যেও এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যায়নি। ফ্যাজেনডার এই চৌহদ্দি ছেড়ে জোয়াম গ্যারাল গত পঁচিশ বছরে ব্রাজিল সীমান্ত পার হয়নি। ইয়াকুইটা আর ওর মেয়েও কোনদিন ব্রাজিলের মাটিতে পা রাখেনি। মাঝে মাঝে ইচ্ছেটা যে মা আর মেয়ের মনেও জাগেনি তা নয়। ইয়াকুইটা দু একবার কথাটা বলে ফেললেও জোয়াম গ্যারাল কথাটা শুনেই দুঃখিত হয়ে চোখ বুজে বলেছে, 'বাড়ি ছেড়ে যেতে বলছো কেন? এখানে কিসের অভাব?'

স্বামীর মনোগত বাসনা বুঝেই ইয়াকুইটাও আর চাপ দিতে যায়নি।

এখন অবশ্য ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। মিনার বিয়ে একটা চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে বেলেমে যাওয়ার, ওখানেই ও ম্যানোয়েল ভ্যালডেজের মা'কে দেখবে। জোয়াম গ্যারাল এটা কেমন করে বাধা দেবে?

ইয়াকুইটা স্বামীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, 'তোমাকে একটা খুব দরকারী কথা বলবো।'

'কি কথা, ইয়াকুইটা?' জোয়াম প্রশ্ন করলো।

'ম্যানোয়েল তোমার মেয়েকে ভালোবাসে, মিনাও ওকে চায়। মনে হয় বিয়ে হলে ওরা খুব সুখী হবে।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটু ঝাঁকুনি খেয়ে জোয়াম গ্যারাল দাঁড়িয়ে পড়লো। চোখের দৃষ্টি মাটির দিকে, নিজের স্ত্রীর দৃষ্টিকে যেন আড়াল করতে চাইলো।

'কি হলো তোমার?' ইয়াকুইটা জিজ্ঞেস করে।

'মিনা? মিনার বিয়ে?' আপনমনেই বলে জোয়াম।

'তোমার আপত্তি আছে বিয়েতে ?' একটু আহত হলো ইয়াকুইটা। 'ওদের লক্ষ্য করোনি ?'

'হ্যাঁ করেছি ? এক বছর ধরেই দেখছি। কিন্তু—' .

কথাটা শেষ না করেই জোয়াম আবার বসে পড়লো। প্রাণপণ চেষ্টায় ক্ষণ পূর্বের সেই দুর্বলতাটা ঝেড়ে ফেলে আবার ও ধীরে ধীরে স্ত্রীর দিকে তাকালো।

ইয়াকুইটা স্বামীর হাত দুটো তুলে ধরে বলে, 'জোয়াম, আমরা কি ঠিক দেখিনি। তোমার কি ধারনা এ বিয়ে সুখের হবে না ?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু···ইয়াকুইটা, বিয়েটা কখন হবে ? শিগগিরই ?'

'তুমি যখনই বলবে, জোয়াম।'

'কিন্তু···কোথায় হবে—এখানে ইকুইটোতে ?'

কথাটা শুনেই মনের ইচ্ছেটা জানাবার সুযোগ পেলো ইয়াকুইটা ? একটু ইতস্ততঃ করে ও বললে, 'জোয়াম, বিয়ের ব্যাপারে আমি একটা কথা ভেবেছি, তুমি যদি রাজী হও বলতে পারি ? গত কয়েক বছরেই আমাদের আমাজনের শেষে নিয়ে যেতে বলেছি। ফ্যাজেনডার কাজের চাপেই তা পারোনি—এবার কয়েকদিন এই সুযোগে ঘুরে এলে কেমন হয়।

কোন উত্তর ফুটলো না জোয়াম গ্যারালের মুখে, কিন্তু ইয়াকুইটার হাতে ধরা ওর হাত যেন কোন দুঃখময় স্মৃতির ভারে কেঁপে উঠতে চাইলো।

'জোয়াম', ইয়াকুটা বলে চললো, 'এমন সুযোগ আর হয়তো আসবে না। মিন্‌হা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে যে। তোমার কি মনে হয় না ওর স্বামীর মা'র সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া দরকার, আমার জায়গাটা তো সেই নেবে। মিনাও মাদাম ভ্যালডেজের মনে আঘাত দিতে চাইছে না। তোমার মা বেঁচে থাকলে তুমিও কি তিনি তোমার বিয়েতে থাকুন চাইতে না ?'

ইয়াকুইটার এ কথাটা শুনেই জোয়াম নিজেকে আর দমন করতে পারলো না।

'ওগো',' ইয়াকুইটা বলে চললো,' 'মিনা' আমার দুই ছেলে বেনিতো আর ম্যানোয়েল আর তোমার সঙ্গে ব্রাজিলে গিয়ে সাগর কূলে বেড়াবার এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। ফেরার পথে আবারও মিনার সংসার দেখে আসবো।'

জোয়াম কথাটা শুনে স্ত্রীর চোখে চোখ রাখলো, কোন কথাই ওর মুখে ফুটলো না।

কে জানে ওর যন্ত্রণা আর ব্যথা কোথায়? কেন সে ও সায় দিতে পারছে না কে জানে? যখন একবার 'হ্যাঁ', বললেই সব কিছুই মিটে যায় তখন বাধা কোথায়? কয়েক সপ্তাহের অনুপস্থিতি ফ্যাজেন্ডার প্রধান সহকারীই চালিয়ে নিতে পারবে। তবুও ইতস্ততঃ করতে লাগলো ও।

'জোয়াম,' ইয়াকুইটা বলে চলে, 'তোমাকে খেয়ালের বশে কথা বলিনি। অনেক ভেবেই বলেছি। তুমি রাজী হলে আমার মনের ইচ্ছাটা পূর্ণ হয়। ছেলেমেয়েরাও সব কথাটা জানে, ওরাও যে তাই চায়। আমরা সকলেই চাই ইকুইটোর চেয়ে বেলেমেই বিয়েটা হোক।'

কনুইয়ের ওপর ভর রেখে বসলো জোয়াম গ্যারাল। এক মুহূর্ত দুহাতে মুখ ঢেকে যেন উত্তরটা ভেবে নিতে চাইলো। মনের মধ্যে একটা ঝড়ই যেন চলছে জোয়ামের। ইয়াকুইটা ব্যাপারটা উপলব্ধি করেই প্রশ্নটা তোলার জন্যে দুঃখিতই হলো। মত না দেওয়ার কারণও ও জিজ্ঞাসা করবেন না।

কয়েকটা মিনিট কেটে গেলে জোয়াম গ্যারাল উঠে দাঁড়ালো। পিছু না ফিরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো ও। তারপর যেন শেষ বারের মতোই ঘরের কোণে বসে থাকা মহীয়সী নারীটির দিকে একবার চোখ তুলে তাকালো যার সঙ্গে জীবনের কুড়িটা বছর ও সুখে বিভোর হয়েছিলো। মুখে এক বিচিত্র ভাব নিয়ে স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গেলো জোয়াম।

'তোমার কথাই ঠিক,' গভীর স্বরে বলে উঠলো জোয়াম গ্যারাল, 'বাইরে যাওয়াই দরকার। কবে যাওয়া ঠিক করেছো।'

'আঃ! জোয়াম! আমার জোয়াম!' আনন্দে কান্না ঠেলে উঠলো ইয়াকুইটার চোখে, 'তোমাকে কি বলে যে আদর করবো।'

জোয়াম দুহাতে বুকে টেনে নেয় স্ত্রীকে। বাইরে কিছু কোলাহল জেগে উঠতেই ম্যানোয়েল আর বেনিতোর সঙ্গে মিনাও ঘরে ঢুকলো।

'শুনেছিস? তোদের বাবা বাইরে যেতে রাজি হয়েছেন,' ইয়াকুইটা বলে ওঠে, 'আমরা সকলে বেলেমে যাচ্ছি।'

গম্ভীর মুখে একটাও কথা না বলে জোয়াম গ্যারাল ছেলেমেয়েদের আনন্দ উপভোগ করলো।

'কবে যাচ্ছি, বাবা? বিয়ের দিন ঠিক করেছো?' বেনিতো প্রশ্ন করলো।

'দিন? দেখা যাক। বেলেমে গিয়েই ঠিক করবো,' জোয়াম উত্তর দিলো।

'ওঃ কি আনন্দ!' মিনা খুশিতে ফেটে পড়লো, 'ওঃ এবার আমাজনকে খুব ভালো করে দেখতে পাবো। দাদা, চলো ভালো করে বইপত্র দেখে রাখি—কিছুই বাদ না যায়।'

॥ পাঁচ ॥ আমাজন

পরদিন বেনিতো ম্যানেয়েলকে বললো, 'আমাজনই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো নদী জানো তো?'

ফ্যাজেনডার দক্ষিণ দিকে নদীর তীরে বসে সামনে বয়ে যাওয়া অসংখ্য জলবিন্দুর মোহময় রূপ দেখছিলো দুজনে। আণ্ডেজ পর্বত বয়ে এই জলধারা আটশো লীগ দূরে আতলান্তিকে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে।

'এতো জল আর কোন নদীতে নেই,' ম্যানোয়েল উত্তর দেয়, 'এত বড়ো অববাহিকাও আর নেই।'

'তা ঠিক। কতো বিশাল প্রান্তর বয়ে নদীটা চলেছে ভাবো একবার।'

'কি সুন্দর হ্রদ আর ঝিল রয়েছে এর মধ্যে মধ্যে, সুইজারল্যাণ্ড বা স্কটল্যাণ্ড, কানাডাতেও পাবে না।'

'আমাজন প্রতি ঘণ্টায় আতলান্তিকে কতো জল ঢালছে জানো? হু'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ঘন মিটার জল।'

'মোট কথা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আর সুন্দর নদী আমাদের এই আমাজন।'

হু'বন্ধু আমাজনের প্রশংসায় সম্পূর্ণ বিভোর হয়েই ছিলো। ওরা নিজেরাও আমাজনেরই সন্তান। বিশাল নদীটির জল ছুঁয়ে চলেছে বলিভিয়া, পেরু, ইকোয়েডর, নিউ গ্রেনেডা, ভেনেজুয়েলা, আর ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ আর ব্রাজিলের গিয়ানা অঞ্চল।

কতো জাতির উত্থান পতনের সাক্ষী আমাজন। এর উৎস মুখ আজও আবিষ্কারকদের বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দেয়।

বহু দেশই এর উৎসের জন্য গৌরব দাবী করতে চায়। পেরু, ইকোয়েডর আর কলম্বিয়ার মধ্যে আজও এ ব্যাপারে বিবাদ লেগে রয়েছে।

তবে বর্তমানে সব সন্দেহেরই বোধ হয় নিরসন হয়ে গেছে যে আমাজন আসলে পেরুর হুরারাকো জেলার টারমার লরিকোচা হ্রদ থেকেই জন্ম নিয়েছে। জায়গাটা দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশের এগারো আর বারো ডিগ্রীর মাঝামাঝি।

লরিকোচা হ্রদ ছেড়ে নবীনা নদীটি ৫৬০ মাইলে আসার পর এর সঙ্গে মিশেছে একটা শাখা নদী, পান্টা। কলম্বিয়া আর পেরু হয়ে নদীটি যখন ব্রাজিলের সীমানা ছুঁয়েছে, তখন এর নাম ম্যারানন বা ম্যারান্‌হাও। ম্যারানন নামটা ফরাসী। ব্রাজিলের সীমান্ত থেকে মানাওস আসার পর এখানে মিশেছে নেগ্রো নদীটি। তারপর থেকেই এর নাম হয়েছে সোলিমায়েস।

উৎপত্তি হবার থেকেই অপূর্ব সুন্দর গতিতেই ছুটে চলেছে আমাজন। আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে ছুটে চলেছে। বাঁ-দিকে এসেছে ম্যারোনা আর তাইগ্রে, দক্ষিণে হুয়ালাগা। পেরুর অভ্যন্তরে দুশো মাইল চলে গেছে ওই শাখা নদী। এখান থেকে ঢল নেমেছে বহু শাখা নদীর আফ্রিকার উত্তর-পূর্বে।

ইকুইটো গ্রামের আশেপাশে এইগুলোই প্রধান শাখা। এতো অসংখ্য শাখা নদী আর কোথাও নেই। এত জল ইউরোপের সব নদীরও সাধ্য নেই ধরে রাখে। জোয়াম গ্যারাল তার পরিবারের সঙ্গে এইসব জল-ধারাই আমাজন পার হতে অতিক্রম করে যাবে।

তুলনাহীনা এই নদীটির সৌন্দর্য অসীম—পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশেই নদীটি বয়ে চলেছে। আর এক বিশেষত্বও রয়েছে আমাজনের—যা মিসিসিপি, লিভিংস্টোন, প্রাচীন কঙ্গো-জাইরা-লুয়ালাবা নদীগুলোর নেই—তা হলো আমাজন দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জায়গা দিয়ে বয়ে চলেছে। এর অববাহিকায় বয়ে যায় পশ্চিমী বাতাস।

অধ্যাপক আগাসিজও প্রতিবাদ করে বলেছেন আমাজনের দুই তীরের সব দেশের আবহাওয়া কখনই অস্বাস্থ্যকর নয়, বরং অতি মনোরম স্বাস্থ্যকর। আবে ডুরাণ্ড নামে আরও একজন বলেছেন এখানকার তাপমাত্রা ২৫° ডিগ্রীর নিচে যেমন নামে না তেমই আবার ৩৩° ডিগ্রী থেকে বেশী ওঠেও না—যারা বছরের তাপমাত্রা গড় পড়তা ২৮°-২৯° ডিগ্রীই থাকে।

এ ধরনের অভিজ্ঞ কথাবার্তার পর অনায়াসেই বলা যায় আমাজনের অববাহিকা এশিয়া বা আফ্রিকার দেশগুলোর মতো প্রচণ্ড গরমের দেশ একটুও নয়।

১৮২৭ থেকে ১৮৩৪/৩৫ পর্যন্ত দলে দলে ভ্রমণকারীও এসে আমাজনের সুনাম বাড়িয়ে তোলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ১৮৫৭ সালের ৩১শে জুলাই। ফ্রান্স আর ব্রাজিলের মধ্যে সুরু হলো গায়নার সীমানো নিয়ে গণ্ডগোল। তখনই আমাজনের প্রায় সম্পূর্ণ

দৈর্ঘ্য জুড়েই চললো জরিপ। আজকের আমাজনের বুকে ভেসে বেড়ায় হাজার হাজার বাষ্পীয় যান।

উত্তর আমাজনের কাছে বহু ইণ্ডিয়ান উপজাতি হারিয়ে গেছে। টুনাটিনেও আজকাল আর মানুষের দেখা মেলে না। নদীর মোহনায় সামান্য কিছু ইণ্ডিয়ানের দেখা কদাচিৎ মেলে। টেফেও মানুষ নেই। জাপুরার মোহনায় উমুয়া উপজাতির জনকয়েক হয়তো ঘুরে বেড়ায়। রিও নেগ্রো নদীর তীরভূমিতে কিছু পর্তুগীজ আর স্থানীয় মানুষের বর্ণসংকর জাতির শুধু দেখা মেলে।

কিন্তু আমাদের ১৮৫২ সালে ফেরা দরকার। আজকের মতো যাতায়াতের সুবিধে তখন ছিলো না। জোয়াম গ্যারালের এই ভ্রমণ তাই মাস তিনেকের কমে হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না।

এই জন্যেই বেনিতো সামনের প্রবহমান উত্তাল জলরাশির দিকে তাকিয়ে বন্ধুকে বললো, 'ভাই ম্যানোয়েল, আমাদের বেলেমে উপস্থিত হওয়া থেকে ছাড়াছাড়ির সময়টুকু তোমার কাছে খুবই কম মনে হবে।'

'হ্যাঁ, বেনিতো,' ম্যানোয়েল বলে, 'খুব বেশিও তো মনে হতে পারে, আমাদের ভ্রমণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে মিনাকে স্ত্রীকে হিসেবে পাবো না।'

॥ ছয় ॥ মাটির বুকে এক অরণ্য

গ্যারাল পরিবার দারুণ খুশি। আমাজনের বুকে ভ্রমণটি খুবই আনন্দের হবে। ফ্যাজেন্ডার মালিক আর তার পরিবারের সঙ্গে খামারের বেশ কিছু কর্মীও তাদের সঙ্গী হবে।

সকলের মধ্যে দারুণ খুশির ভাবটা দেখেই সম্ভবতঃ তার নিজের সেই উত্তেজনাটুকু ভুলে গেলো। যেদিন যাওয়া ঠিক হলো সেদিন থেকেই যেন ও অন্য মানুষ হয়ে গেলো।

ওই সময় আমাজনের বুকে খুব বেশি জলযানের দেখা মিলতো না। কিছু কিছু ব্যবসাদারই নিজেদের প্রয়োজনে এগুলো চালাতো। নদীর ধারের কিছু ইণ্ডিয়ানও নৌকো জাতীয় কিছু চালাতো। এই নৌকো-গুলোর নাম 'উবাস'। গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী শালতি জাতীয় নৌকো-গুলো প্রথমে আগুনে পুড়িয়ে গর্ত করে নেওয়া হয়, তারপর কুড়ুলের সাহায্যে কেটে নেওয়া হয়। মাথার অংশ ছুঁচলো, পেছনটা দারুণ ভারী। ডজন দুয়েক যাত্রী বহন করতে পারে এগুলো—মালও নিতে পারে তিন-চার টন। এছাড়াও 'ইগারিটিয়াস' নামে একটু বড়ো আকারেরও নৌকো মেলে। দু-একটা মাটি আর খড়ের তৈরী ঘরও থাকে—ইণ্ডিয়ানদের কাছে এগুলো যেন ভাসন্ত বাড়ী। আর একরকম জলযানও ছিলো তার নাম 'জাঙ্গাডা'।

এগুলোর কোনটাই জোয়াম গ্যারালের পছন্দ হলো না। আমা-জনের বুকে ভাসবার মত ঠিক করার সময় থেকেই সে ভেবে রেখেছিলো যতোটা সম্ভব মালপত্র পারাতে নিয়ে যাবে। সবাই এতে খুশি, কেবল ম্যানোয়েল ছাড়া। তার ইচ্ছে কোন বাষ্পীয় যানে বেরুনো। জোয়ামের ব্যবস্থা নেহাতই সেকেলে বই তো নয়।

ইকুইটোদের থাকবার জায়গার মধ্যে অনেকখানি জুড়েই ছিলো চমৎকার অরণ্য। দক্ষিণ আমেরিকার মাঝ বরাবর এ অরণ্য অসীম। বিশাল এই অরণ্য জুড়ে নানা জাতের অজস্র মূল্যবান গাছের ছড়াছড়ি। জোয়াম গ্যারাল এ সম্বন্ধে খুবই দক্ষ। এসব গাছের কাঠ থেকেই তৈরী হয় আসবাবপত্র, বাড়ি ঘর, আরও নানা জিনিস। জোয়াম প্রতি বছরই এই গাছ থেকে মোটা টাকা ঘরে তোলে।

সামনে বিস্তৃত বিরাট নদীটাই পথ হিসেবে ব্যবহার করে জোয়াম। প্রতি বছর শত শত গাছ কাটার পর, তার তক্তা চেরাই করে, গুঁড়ি কেটে জলে ভাসিয়ে পারাতে পাঠানো হয়। নদীর গতি বুঝে এ কাজ করার জন্য দক্ষ লোকেরও অভাব নেই।

এ বছরও জোয়াম গ্যারাল অন্যান্য বছরের মতোই কাজে নামতে

মনস্থ করেছিলো। একে একে সব কিছুই বেনিতোর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু এখন সময় নেই বললেই চলে—অনেক কাজই বাকি। ফ্যাজেনডার দিকে, নদীর তীরের আধ মাইল জায়গার গাছ এখনি কাটা দরকার। একটা 'জাঙ্গাডা' তৈরী করতে এতো কাঠেরই প্রয়োজন—এগুলো আকারে প্রকাণ্ড—যেন ছোটখাটো এক দ্বীপ।

এই রকম এক জাঙ্গাডায় সকলকে নিয়ে রওয়ানা হবার ব্যবস্থাই ভেবে রেখেছে জোয়াম গ্যারাল। এগুলো নিরাপদও বটে।

বাবার ইচ্ছের কথা শুনে হাততালি দিয়ে ওঠে মিণা, 'ওঃ। খুব মজা হবে।'

ইয়াকুইটাও খুশি হলো, 'বিপদ আপদের ভয়ও এতে থাকবে না। আরামেই যেতে পারবো, কি বলো?'

'তা, মাঝে মাঝে থামার মুখে কিছু কিছু জন্তু জানোয়ারও শিকার করা যাবে,' বেনিতো বলে।

'কিন্তু এতে বেশ সময় লাগবে তো?' ম্যানোয়েল বলতে চায়, 'আর একটু তাড়াতাড়ি চলে এমন কিছুতে গেলে হতো না?'

কিন্তু তরুণ ডাক্তারের কথাটা কারো কানেই ঢুকলো না।

জোয়াম গ্যারাল ফ্যাজেনডার ইণ্ডিয়ান পরিচালককে এবার ডেকে পাঠালো।

'এক মাসের মধ্যেই আমার এই ভাঙ্গাডা তৈরী করা চাই।'

'আজই কাজ সুরু করছি হুজুর!' লোকটি জানায়।

কাজটা অবশ্য নেহাৎ সামান্য নয়, ঝামেলা অনেক। শ'খানেক ইণ্ডিয়ান কাজে লেগে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। মে মাসের প্রথম পনেরো-দিনে শ'য়ে শ'য়ে গাছ কাটা হয়ে গেলো।

পরিচালক লোকটি দারুণ কাজের সন্দেহ নেই। জোয়াম গ্যারালের-হুকুম মাফিক কাজ সুরু করতে ওর এক লহমাও দেরী হয়নি। লম্বা বাঁকানো করাত নিয়ে দলে দলে মানুষ কাজে নেমে পড়লো। জঙ্গল সাফ করা হতে লাগলো। গাছের ডাল পালা ছেঁটে ফেলার ফলে

শ'য়ে শ'য়ে হতভাগ্য বাঁদর কূল বন ছেড়ে পালাতে লাগলো, বেচারিদের ঘর বাড়ি বলতে তো ওই গাছগুলোই। কয়েকদিনের মধ্যেই সারা এলাকা জুড়ে পড়ে রইলো যেন এক ধ্বংসস্তূপ।

তিন সপ্তাহ পরে আমাজন আর ন্যানে নদীর কোনে আর একটা গাছও রইলো না। সব কেটে সাফ করা হয়ে গেলো। তাকিয়ে দেখলো জোয়াম গ্যারাল। ত্রিশ বছরের ফসল এভাবে :তিন সপ্তাহে ধ্বংস হয়ে গেলো!

মাস প্রায় শেষ হয়ে আসার মুখে হাজার হাজার কাঠ পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হলো। এখানেই তৈরী হবে বিরাট সেই জাঙ্গাডা। যার মধ্যে থাকবে বহু ঘর—যেন পুরোপুরি একটি গ্রাম। তৈরী হয়ে গেলে নদীর জল ফুলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এটা কয়েক'শ লীগ দূরে আতলান্তিকের কূলে গিয়ে পৌঁছবে এক সময়।

সমস্ত কাজটা একাই তদারক করতে লাগলো জোয়াম গ্যারাল। ইয়াকুইটা ব্যস্ত রইলো সিবিলের সঙ্গে গোছানোর কাজে। বেচারি নিগ্রো মেয়েটা বুঝতেই পারছে না এভাবে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনটা কোথায়! কিই বা দেখার থাকতে পারে।

মিনা আর তার সঙ্গিনীর ব্যাপার কিছুটা যেন আলাদা। ওদের কাছে তো এ শুধু কিছু দিনেরপ্রমোদ ভ্রমণ নয়—চিরকালের মতোই যাবে ওরা। কতো ছোটো খাটো ব্যাপারই তাই নজর দিতে হচ্ছে মিনাকে। একটু বেদনা বিহ্বল সে। লিনা অবশ্য ভাবছে না একটুও—ইকুইটো ছেড়ে যেতে ওর আপত্তি নেই বলেই মনে হয়। মিনা ভ্যাল্ডেজ বা মিনা গ্যারাল দুজনেই ওর কাছে সমান—এক জায়গায় থাকলেই হলো।

বাবার কাজে সাহায্য করছে শুধু বেনিতো। কাজও প্রায় শেষ। কাজ কর্ম শিখে নিতে বেশি দেরী হয়নি বেনিতোর।

ব্যতিক্রম শুধু ম্যানোয়েল, যে শুধু মিনা ও তার মা'য়ের কাজকর্মে সাহায্য করে চললো।

॥ সাত ॥ আঙ্গুরলতা অনুসরণ

দিনটা ছিল রবিবার, ২৬শে মে, বেনিতো আর ম্যানোয়েল মিনাকে সঙ্গে নিয়ে ফ্যাজেন্‌ডার উল্টোদিকের আমাজ্‌নের দক্ষিণ তীরের ঘন বনের মধ্যে ঘুরে আসবে ঠিক করলো। দুই তরুণ তৈরী হয়েই নিলো —তবে শিকারের কোন মতলব ছিলো না। লিনাও মিনাকে চোখের আড়াল করে না বলেই সেও সঙ্গে রইলো।

জোয়াম গ্যারাল বা ইয়াকুইটা, দুজনের কারোই ওদের সঙ্গে যাওয়ার সময় ছিলো না। জাঙ্গাডার ব্যাপারটা এখনও শেষ হয়নি—হাতে সময়ও কম, একটা দিনও নষ্ট করার মতো হাতে নেই।

মিনা তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। প্রাতরাশ শেষ হবার পরেই দুই বন্ধু আর মিনা ও লিনা দুটি নদীর মোহনার দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লো। এক কালা আদমীও ওদের সঙ্গী হলো। সবাই মিলে খামারের ব্যবহারের একটা উবাসে উঠলো। ইকুইটো দ্বীপ ঘুরে ওরা এবার পৌঁছলো আমাজনের দক্ষিণ তীরে। ওরা নেমো পড়লো ভারী চমৎকার বিরাট গাছের এক ঝোপের ওপর। গাছগুলো প্রায় ত্রিশ ফিট উঁচু, আকাশ ছুঁছু ছুঁই। সবুজ মখমলের মতো লতার ঝোপ যেন প্রকৃতির অনন্য এক রূপ!

'ম্যানোয়েল', মিনা বলে, 'বনকে আমায় ভালবাসতে দাও একবার, আমাজনের এ জায়গায় তুমিতো নেহাত বিদেশী। এখানে আমিই কর্ত্রী মনে রেখো।'

'প্রিয়তমা মিনা', তরুণ ম্যানোয়েল জবাব দেয়, 'তুমি এখানেও যেমন কর্ত্রী তেমনি আমার দেশ বেলেমেও তুমি কর্ত্রী থাকবে, আর তাই,—।'

'আরে শোনো,' ম্যানোয়েল কথাটা শেষ করার আগেই বেনিতো

বলে ওঠে, 'তোমরা এখানে প্রেমের বুলি কপচানোর জন্য আসোনি নিশ্চয়ই! তোমরা যে পরস্পরের বাগদত্ত ঘণ্টা কয়েকের জন্য একটু ভুলে যাও।'

'কয়েক ঘণ্টা? এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারবো না।' ম্যানোয়েল বলে।

'মিনা হুকুম করলে ভুলবে নিশ্চয়ই?'

'মিনা এমন হুকুম করতেই পারে না।'

'কে জানে, করতেও তো পারে,' লিনা হাসতে হাসতে বলে।

ম্যানোয়েলের দিকে হাত বাড়িয়ে মিনা বলে, 'লিনার কথাই ঠিক, কথাটা একেবারে ভুলে যাও! ভুলে যাও, দাদার জন্যেই এটা দরকার। বিয়ে ভেঙে দিলাম, বুঝলে? এই মুহূর্ত থেকে আমরা আর বাগদত্ত নই—যতোক্ষণ আমরা বেড়াবো। আমি তোমার বন্ধুর বোন—আর তুমিও আমার বন্ধু।'

'ঠিক,' বেনিতো বলে ওঠে।

'বাঃ চমৎকার! আমরা সবাই পরস্পরের অচেনা,' লিনা বলে।

'প্রথম যেন আমাদের দেখা হলো, কেমন?' মিনা হাসেলা।

'মাদমোয়াজেল,' মিনার দিকে তাকালো ম্যানোয়েল।

'আপনি কে? গম্ভীর স্বরে বললো মিনা।

'ম্যানোয়েল ভ্যাল্ডেজ।' আপনার ভাই একটু পরিচয়ের পালাটা শেষ করে দিলে বাধিত হই।'

'আঃ, তোমাদের পাগলামি থামাও,' বেনিতো চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমারই দোষ। তোমরা বাগদত্তই থাকো, বাপু। যদ্দিন খুশি তাই থাকো।'

'যদ্দিন খুশি!' মিনার গলা দিয়ে কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে আসতেই লিনার হাসি আর বাঁধ মানলো না।

'চলো এগুনো যাক,' বেনিতো বোনের বিহ্বলতাটুকু কাটানোর জন্যেই বলে ওঠে।'

'এক মিনিট, দাদা।' তুমি তো বলেছিলে কেউ কাউকে না চেনার ভান করবো, কেমন? তোমাকে খুশি করতে তাই করেছি, এখন আমাকে খুশি করতে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করে ভুলে যেতে হবে—।'

'কি আবার ভুলবো?'

'তুমি শিকার করতে জানো।'

'কি? তুই আমাকে শিকার করতে বারণ করছিস—।

'এই সুন্দর পাখি, টিয়া আর সারসগুলোকে কিছুতেই গুলি করতে পারবে না তুমি। দেখো কেমন মনের আনন্দে ওরা বিভোর হয়ে আছে গাছের ডালে ডালে। তবে কোন জাগুয়ার যদি কাছে ওৎ পেতে থাকে তাহলে—'

'কিন্তু বোন—'

'তা যদি না থাকে, তাহলে ম্যানোয়েলের হাত ধরে জঙ্গলের বুকে আমরা হারিয়ে যাবো, আর তুমি আমাদের খুঁজবে।'

'আমার অস্বীকার করাই উচিত, কি বলো?' ম্যানোয়েলের দিকে তাকালো বেনিতো।

'আমারও তাই মনে হয়,' ম্যানোয়েল জবাব দিলো।

'বটে! নাঃ।' বেনিতো বলে, 'আমি কিন্তু অস্বীকার করছি না। বরং তোমাদের একটু মজাই দেখাবো। চলে এসো।'

ওরা চারজন আর নিগ্রো অনুচরটি বিশাল এক ঝোপের নিচে ঢুকলো। গাছগুলির ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোটুকুও নিচে এসে পৌঁছয়না।

আনন্দে মশগুল হয়ে কথা বলতে বলতে ওরা এগুলো। ঝোপে পথ আটকে গেলে নিগ্রো অনুচর অস্ত্রের ঘায়ে রাস্তা করে দিতে লাগলো। দলে দলে পাখিরা উড়ে ছড়িয়ে পড়লো অরণ্য আকাশে। অবাক হল মিনা।

এই ডানা মেলে ধরা বিহঙ্গেরা যেন প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টি। কি নেই এখানে! সবুজ টিয়া, কলধ্বনি করে ওঠা শুক, গায়ক পাখি, লম্বা ঠোঁটওয়ালা সারস আর তোতা পাখি। হঠাৎ যেন সবাই শান্ত হয়ে

গেলো—এক ঝাঁক বাজপাখি নেমে আসতেই। এরাই হল অরণ্যের ভীতি।

এক ঘণ্টাও হয়নি, ওরা এক মাইল যেতেই নদীর শেষ প্রান্তে গাছ-পালার রূপও যেন বদলে যেতে লাগলো—ক্রমশঃ কমে এলো বন্য প্রাণীর সংখ্যাও। শুধু মাটির ওপর পঞ্চাশ ষাট ফিট উঁচুতে দেখা গেলো শ'য়ে শ'য়ে বাঁদর। এখানে সূর্যের কিরণ পৌঁছয় না—হয়তো কখনও এক ফালি পড়ন্ত রোদ স্পর্শে রাঙিয়ে দেয় সবুজ অরণ্যকে।

'বাঃ কি সুন্দর!' অপার খুশির আমেজ ঝরলো মিনার গলায়।

'ঠিক জায়গাতেই তুই এসেছিস, মিনা। তোর কথাতে তাই মনে হচ্ছে,' বেনিতো বলে।

'যতো খুশি ঠাট্টা করো,' মিনা জবাব দেয়, 'এ সৌন্দর্য তো সাময়িক, তাই না ম্যানোয়েল? এতো ভগবানের অপার করুণারই দান, বিশ্বময় ছড়ানো।'

'বেনিতোকে হাসতে দাও মিনা,' ম্যানোয়েল বলে, 'যতোই গোপন করুক, আসলে বেনিতোও কবি—সময় মতো আমাদেরই মতো দেখো ও প্রকৃতির এ সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। তবে কি জানো, ওর হাতে বন্দুক থাকলেই ব্যাস, কবিতার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হতে দেরী লাগে না।'

'এখন তাহলে কবিই হও,' উত্তর দেয় মিনা।

'তাহলে তাই হোক, আমি কবিই হই,' বেনিতো বলে, 'প্রকৃতি তুমি সত্যিই মোহময়ী।'

এটা স্বীকার না করে উপায় নেই বেনিতোকে বন্দুক ধরতে না দিয়ে সত্যিই দারুণ অসুবিধাতেই ফেলে দিয়েছে মিনা। এ বনে শিকারের তো অভাব নেই।

বনের মধ্যে বৃক্ষহীন জায়গাগুলোয় ফাঁকা জায়গার অভাব নেই। সেখানে ওদের নজরে এলো বেশ কয়েক জোড়া উটপাখি—আকারে চার পাঁচ ফিট।

'প্রতিজ্ঞা করে কি ফ্যাসাদেই পড়েছি!' বোনের নজর পড়তেই কাঁধ থেকে আপনা আপনি হাতে উঠে আসা বন্দুকটা আবার কাঁধে ঝোলাতে ঝোলাতে বলে বেনিতো।

'পাখিগুলোকে কিন্তু আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত, 'ম্যানোয়েল বলে, 'ওগুলো সাপ খায়।'

'সাপেদেরও ধন্যবাদ জানানো উচিত,' বেনিতো জবাব দিলো, 'ওরা পোকামাকড় খায়, তেমনি পোকামাকড়রাও আরও সাংঘাতিক কীট খেয়ে ফেলে। আসলে সকলকেই সমান চোখে দেখা দরকার।'

বেনিতো সত্যিই মহা ধার্মিক হয়ে উঠলো যখন ওর সামনে গোটা কয়েক টেপির এসে হাজির হলো। ব্রাজিলে হাতির ছোট সংস্করণ এই জানোয়ারগুলোকে বলে 'এ্যান্টা'। জন্তুগুলো ইতিমধ্যেই উত্তর আমাজন আর তার শাখানদীগুলোর কাছাকাছি প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'তা যাই হোক,' এক মুহূর্ত থামতে থামতে বললো বেনিতো, 'হাঁটতে মন্দ লাগে না, তবে উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে হাঁটতে।'

'উদ্দেশ্যবিহীন হবে কেন?' ওর বোন জবাব দিলো, 'আমরা এসেছি দেখতে, দুচোখ ভরে দেখতে আর উপভোগ করতে। মধ্য আমেরিকার এই বন শেষবারের মতোই দেখতে এসেছি, এগুলো আর দেখতে পাবো না—তাই তো এদের শেষ বিদায় জানাতে এসেছি আজ আমরা।'

'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে,' লিনা বলে উঠলো।

'লিনার মতলব আবার একটা মতলব হতে পারে নাকি?' বেনিতো বলে।

'আমার মনে হয়, মিঃ বেনিতো আমার মতলবটা শুনলে সত্যিই আপনি খুশি হবেন,' লিনা জবাব দেয়।

'খুলেই বল্ না ব্যাপারটা,' মিনা জানতে চাইলো।

'ঐ আঙ্গুরলতাটা দেখতে পাচ্ছো?' লিনা হাত তুলে সামনের বিরাট একটা লজ্জাবতী লতা গাছের গায়ে জড়িয়ে ওঠা আঙ্গুরলতা দেখাতে চাইলো।

'ব্যাপারটা কি ?' বেনিতো জানতে চাইলো।

'আমরা ওই আঙ্গুরলতার শেষ মাথাটা খুঁজে বের করবো,, মিনা জানালো।

'মতলবটা ভালোই, উদ্দেশ্যও মন্দ না।' হালকা গলায় বলে বেনিতো, 'লতাটার খোঁজে ছুটবো আমরা, বাধা মানবো না, যতো ঝোপঝাড়, গাছপালা, পাথর নদী নালা যাই সামনে পড়ুক—।'

'ঠিক বলেছো দাদা,' মিনা বলে,' লিনা মাঝে মাঝে অদ্ভুত হয়ে ওঠে।'

'তাহলে চলো,' বেনিতো আহ্বান জানালো।

একদল হাসিখুশি মানুষের মতো ওরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লো।

এই লতাগাছটা ওদের প্রায় অসীমে নিয়ে ফেলতো ওরা যদি ওর শেষ প্রান্তে সত্যিই পৌছতে চাইতো। অরিয়নের সুতোর মতোই এটা মিনোস'এর উত্তরাধিকারিনীর সেই গোলকধাঁধাঁ থেকে বেরুনোর চেষ্টা ততোই নিজেকে যেন জড়িয়ে ফেলা। এ এক আশ্চর্য লতা—দৈর্ঘ্যে কয়েক মাইলও হয়। এটার দেশীয় নাম জ্যাপিকাঙ্গা।'

গাছের পর গাছে এঁকে বেঁধে চলেছে লতাটা। কখনও বা কোন বিশাল তরুলতার গুঁড়িতে পাক খেয়ে জড়িয়ে, কখনও বা ডালপালায় জড়িয়ে—একটা ড্রাগন যেন গাছ থেকে লাফিয়ে নামতে চেয়েছে মেহগনী গাছে। আবার একটু পরেই বিশাল আকৃতির কোন 'বাকাব্বাস' নামের গাছে জড়িয়ে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ ওদের থামতে হলো। লতাগাছটির নিশানা হারিয়ে ফেললো ওরা। এখন এক মাত্র উপায় আবার পিছিয়ে গিয়ে আগাছাগুলোর মধ্য থেকে আসল মুখটা খুঁজে বের করা।

'ওই তো লতাটা,' লিনা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি ঠিক দেখেছি।'

'না না তোর ভুল হচ্ছে,' লিনা জবাব দিলো, 'ওটা অন্য একটা আঙ্গুর লতা।'

'না, লিনাই ঠিক বলছে,' বেনিতো জবাব দেয়।

উঁহু, লিনারই ভুল,' ম্যানোয়েল বলে।

তর্কাতর্কি বেশ জমে উঠলো। কেউই নিজের ভুল মানতে চায় না। শেষ পর্যন্ত বেনিতো আর সেই নিগ্রো লোকটাকেই লতার মুখ খুঁজতে গাছের উপর উঠতে হয়। নানা জড়ানো লতার মধ্যে থেকে আসল লতাটা খুঁজে নেওয়া অবশ্য নেহাৎ কিছু নয়।

লতাটা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া মাত্রই আনন্দের ঝড় বয়ে গেল সকলের মধ্যে। খানিক থেমে থাকা লুকোচুরি খেলা আবারও সুরু হয়ে গেলো তাই। প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেছে ইতিমধ্যে—কিন্তু লতাটার শেষ এখনও কোথায় কে জানে!

আচমকাই এবার খানিকটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়লো সবার। গভীর অরণ্য যেন হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিতে চাইছে এখানে। সামনে শুধু একটা কলা গাছ—ওটার দেহে পাক খেয়েই আবার লতাটা দূরে কোথাও লুকোচুরি খেলতে হারিয়ে গেছে।

'আমরা কি এখনই থামবো, নাকি?' ম্যানোয়েল জানতে চাইলো।

'কখনও না। কিছুতেই এটার শেষ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা থামবো না,' বেনিতো প্রতিবাদ করে ওঠে।

'কিন্তু,' মিনা বলে, 'বাড়ি ফিরতে হবে তো কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

'না না চলুন না আরও এগিয়ে যাই,' লিনা তাড়া লাগালো।

সবাই আবার লতার পেছনে এগিয়ে চললো। প্রায় মিনিট পনেরো পরে ওরা আমাজনের একটা ছোট শাখানদীর কাছে বেহড়ে এসে পৌঁছলো। নদীটার ওপরে পরস্পর জড়াজড়ি করে দড়ির মতো একটা লতার সাঁকো নদীর উপর ঝুলে রয়েছে। আর এক গোছা লতা সাঁকো-টার হাতলের মতোই জেগে রয়েছে।

বরাবরই সামনে থাকা বেনিতো সোজা গিয়ে ওঠে লতার সাঁকোর ওপর।

ম্যানোয়েল ওর প্রেয়সীকে এগুতে দিতে চাইলো না।

'না তুমি যেও না মিনা বেনিতোর ইচ্ছে হয় ও এগিয়ে যাক,' ম্যানো-য়েল বলে।

'ভয় কি চলো ম্যানোয়েল, আমরাও উঠে পড়ি,' আহ্বান জানায় মিনা।

সকলেই সাঁকোটা পার হতেই চোখে পড়লো বেহড়ের ওপর দোল খাওয়া সাঁকোটা। নদীর দিকে লক্ষ্য রেখে মিনিট দশেকও হয়নি ওরা হেঁটে চলেছিলো। আচমকাই এবার ওদের থামতে হলো। কারণ অবশ্য ছিলো।

'লতার শেষটা পাওয়া গেছে নাকি?' মিনা জানতে চাইলো।

'না,' বেনিতো জবাব দিলো, 'তাহলেও আমাদের খুব সাবধানে এগুতে হবে। ওই দেখো,' বেনিতো প্রকাণ্ড একটা শাল গাছে জড়িয়ে ওঠা আঙুরলতাটার মধ্যে কিছু আলোরনের দিকে হাত দেখালো।

'ওটার ওরকম হচ্ছে কেন?' ম্যানোয়েল প্রশ্ন করলো।

'হয়তো কোন জানোয়ার হবে, আমাদের একটু সতর্কভাবে এগুতে হবে।'

বেনিতো ওর বন্দুকের ঘোড়ায় হাত রেখে সকলকে থামতে ইঙ্গিত করে প্রায় দশ পা এগিয়ে গেলো। ম্যানোয়েল, মেয়েরা আর নিগ্রোটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ বেনিতোকে চিৎকার করে একটা গাছের দিকে ছুটতে দেখেই ওরাও পিছনে পিছনে ছুটলো।

আচমকাই ওদের চোখের সামনে ফুটে উঠলো এক বিচিত্র দৃশ্য!

আঙুরলতার ফাঁকে গলা আটকে একটা লোক মুক্তি পাবারজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে—লতাটা একটা দড়ির মতোই লোকটার গলাটা পেঁচিয়ে রেখেছে। যতোই সে ছটফট্ করছে ততোই ওর প্রচণ্ড মৃত্যুযন্ত্রণা প্রকট হয়ে উঠছে।

বেনিতো প্রায় লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুরি দিয়ে দ্রুত ফাঁসটা কেটে দিলো।

লোকটা মাটিতে পড়ে যেতেই সযত্নে তাকে তুলে ধরলো বেনিতো যদি হতভাগ্যকে এখনও বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয়।

'মিঃ ম্যানোয়েল। মিঃ ম্যানোয়েল!' লিনা চিৎকার করে ওঠে, 'দেখুন, এখনও লোকটার নিঃশ্বাস পড়ছে। শিগগিরই ওকে বাঁচান।

'ঠিক। এখনই হাত লাগানো দরকার,' ম্যানোয়েল এবার এগিয়ে এলো।

লোকটার বয়স প্রায় বছর ত্রিশ, ফর্সা রঙ, পোশাক মলিন, ছিন্ন-দেখে প্রচুর কষ্ট ভোগ করেছে বলেই মনে হয়।

লোকটার পায়ের কাছে একটা খালি ফ্লাস্ক মাটিতে পড়েছিলো—এছাড়াও পড়ে ছিলো, একটা কাপ আর শাল কাঠের একটা গোলাকৃতি বল। বলটা খানিকটা দড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিলো।

'ওঃ! লোকটা গলায় দড়ি দিতে চাইছিলো,' শিউরে উঠলো লিনা, 'আহা! এতো কম বয়স, লোকটা কেন মরতে চাইছিলো?

ইতিমধ্যে ম্যানোয়েলের পরিচর্যার গুণে লোকটার মধ্যে প্রাণের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। একটু পরেই সে চোখ মেলে তাকালো আর তার নিঃসৃত আর্তনাদ চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

বেনিতো ঝুঁকে পড়লো, 'কে তুমি? বন্ধু?'

'আমি অন্যের গলগ্রহ এক হতভাগ্য ছাড়া কিছু না।'

'কিন্তু তোমার নাম কি?'

'একটু সময় দিন আমাকে, একটু সামাল নিই আগে,' কপালে একবার হাত বোলাতে চাইলো লোকটা, 'আমার নাম ফ্রাগোসো, আপনাদের দাস। আপনাদের চুল ছেঁটে দাড়ি কামিয়ে আরাম দেওয়াই আমার কাজ। এখনও এ কাজে কেরামতি দেখাতে পারি। আমি একজন ক্ষৌরকার।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু একাজ করতে যাচ্ছিলে কেন?'

'কি বা করতাম, স্যার?' দুঃখের হাসি ছড়ালো ফ্রাগোসোর ম্লান মুখে? হতাশায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম স্যার—এক মুহূর্ত দেরী হলে অন্য এক জগতেই বোধ হয় অনুশোচনা করতে হতো। দেশময় ৮০০ লীগ ঘুরে

বেড়ানো কি চাট্টিখানি কথা, তার ওপর পকেটে একটা আধলাও না না থাকা একটুও সুখের কথা নয়। আমি তাই আর মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।'

পরিণতিটা অবশ্য খারাপ হলো না। ফ্রাগোসো একটু সামলে নিতেই দেখা গেলো লোকটা খুবই আমুদে হাসিখুশি আর প্রাণ প্রাচুর্যেই ভরা। উত্তর আমাজনের তীরে তীরে ঘুরে বেড়ায় এমন ক্ষৌরকারদেরই একজন লোকটা। ইণ্ডিয়ান স্ত্রী পুরুষরা ওদের কাজের মস্ত সমঝদার। কিন্তু বেচারি নেহাতই কাহিল। গত চল্লিশ ঘণ্টায় পেটে একটা দানাও পড়েনি।

'আমাদের সঙ্গে ইকুইটোর ফ্যাজেন্ডায় যেতে রাজি আছো?' বেনিতো প্রশ্ন করে।

'খুশি মনেই যাবো,' ফ্রাগোসো তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, 'আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, এ প্রাণ তাই আপনার।'

'কি দিদি, এগিয়ে আসতে চেয়ে আমরা ভালো করিনি?' লিনা বলে উঠলো।

'ঠিক করেছি,' হাসলো মিনা।

'হুঁ' বেনিতো বলে, 'আমি অবশ্য ভাবিনি লতাটার শেষে একটা ঝুলন্ত মানুষ দেখবো।'

'তা যা বলেছেন, এক নাপিত মরবার চেষ্টা করছে! 'ফ্রাগোসো হালকা গলায় বলে ওঠে।

বেচারি ফ্রাগোসো ক্ষণপূর্বের আতঙ্কটা কাটিয়ে উঠে এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আসল ঘটনাটা এবার ও শুনতে পেলো। আঙুরলতা ধরে এগুবার মতলবটা যে লিনার সে কথা শুনে সে লিনাকে ধন্যবাদ জানাতেই সকলে ফ্যাজেন্ডার দিকে রওয়ানা হলো। ফ্যাজেন্ডায় পৌঁছতেই ফ্রাগোসো যে অভ্যর্থনা লাভ করলো তাতে ওর আর ক্ষণপূর্বের সেই সাংঘাতিক কাজ করার ইচ্ছে বা প্রয়োজন এতোটুকুও রইলো না।

॥ আট ॥ জাঙ্গাডা

জঙ্গলের প্রায় আধ মাইল চতুষ্কোণ জায়গা সাফ করা হয়ে গেলো। নদীতীরে পড়ে থাকা পুরনো কাঠগুলো দিয়ে ভেলা বানানোর কাজ করার দায়িত্ব এবার ছুতোর মিস্ত্রীদের।

জোয়াম গ্যারালের খবরদারিতে ইণ্ডিয়ানরা একাজে তাদের কেরামতি দেখালো। বাড়িঘর তৈরী বা জাহাজ তৈরীর কাজে লাল মানুষগুলো সত্যিই দারুণ দক্ষ।

গাছগুলোকে কিন্তু আমাজনের জলে ভাসানো হলো না। জোয়াম গ্যারালের মতলব অন্য রকম। বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়িগুলো তীরের সমতল জায়গায় রাখা হলো। আমাজন আর ন্যানে নদীর মোহনায় কিছু জমি আগেই সমতল বানিয়ে রাখা হয়েছিলো। ওই জায়গাতেই জাঙ্গাডাটা বানাবার কথা। এখান থেকেই হবে যাত্রা শুরু।

এখানে এই বিশাল জলরাশির ভৌগোলিক কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া একান্ত দরকার, বিশেষ করে নদী কূলের বাসিন্দারা নিজের চোখে যে বিশেষ একটা ঘটনা দেখতে অভ্যস্ত তার কথাই।

আমাজন বেশ নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে যেখানে নদীটি পূবমুখো হয়েছে, ইকোয়েডর আর পেরুর সীমান্ত ছুঁয়ে। এর অববাহিকা জুড়ে একই রকম জলবায়ুর প্রাধান্য ঘটেছে। এই অঞ্চলটায় দুটো আলাদা ঋতুর দেখা মেলে যখন বৃষ্টি হয়। ব্রাজিলের উত্তরে বর্ষা নামে সেপ্টেম্বর মাসে আর দক্ষিণে তার সুরু হয় মার্চ মাসে। এর ফলে আমাজনের দক্ষিণ দিকের আর বাঁ দিকের উপনদীগুলোয় ছ'মাস পরে পরে বন্যা নামে—আর তাইতেই আমাজনের জল সবচেয়ে বেশি বেড়ে ওঠে জুন মাসে আর আবার সবচেয়ে কম হয় অক্টোবরে।

জোয়াম গ্যারাল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এটা জানতো। আর এটা সে জানতো বলেই নদী তীরে সুবিধে মতোই সে জাঙ্গাডাটা বানিয়ে নিতে চাইছিলো।

প্রথম স্তরটা পুরোপুরিই মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে সাজানো হলো। দুটো গুঁড়ির মাঝখানটায় সামান্য ফাঁক– আড়াআড়িভাবে কাঠের টুকরো দিয়ে গুঁড়িগুলোকে শক্ত করে আটকানো হলো। মোটা কাছির মতো 'পিয়াকাবা' দড়ির সাহায্যে বেঁধে ফেলার কাজ করা হলো।

আকৃতিটা হয়ে দাঁড়াল বিশালই। বিশাল পোতটা লম্বায় হাজার ফিট আর চওড়ায় ষাট ফিট—মোটমাট তলের মাপ ষাট হাজার বর্গফুট। আমাজনের পুরো একটা জঙ্গলকেই যেন কাজে লাগানো হয়ে গেলো।

এ কাজে সকলেরই মতামত নিলে জোয়াম গ্যারাল। ফ্রাগোসোর মতও নেওয়া হলো।

ফ্যাজেনডায় এসে ফ্রাগোসো কেমন কাটাচ্ছে দেখা যাক। এখানে আশ্রয় পেয়ে সে দারুণ খুশি।

এমন খুশি সে সারা জীবনেও কখনও হয়নি। জোয়াম গ্যারালও তাকে প্যারাতে নিয়ে যেতে চেয়েছে ইতিমধ্যেই। ফ্রাগোসা এক কথাতেই তৎক্ষণাৎ রাজি—

জোয়াম গ্যারালকে হাজার হাজার ধন্যবাদ জানিয়ে জাঙ্গাডা তৈরীর কাজে নেমে পড়লো ফ্রাগোসো। সত্যিই লোকটি ওস্তাদ। লিনার মতোই হাসিখুশি মানুষও, মুখে গান লেগেই আছে, হাসি মস্করাতেও জুড়ি নেই। সকলেরই তাই ভালো লেগে গেলো।

আসলে কিন্তু ওই অল্পবয়সী দোঁ-আশলা মেয়েটার প্রতিই যেন ওর একটু বেশি কৃতজ্ঞতা।

'ওঃ, দারুণ একখানা মতলব বের করেছিলেন কিন্তু, মিস লিনা', ফ্রাগোসো লিনাকে বারে বারেই শোনাতে চায়, 'আঙুরলতার পেছনে ছোটা!'

'ওটাতো হঠাৎই হয়ে গেছিলো মিঃ ফ্রাগোসো,' লিনা হাসতে হাসতে জবাব দেয়, 'অতোখানি কৃতজ্ঞতা দেখানোর মতো কিই বা করেছি।'

'করেননি! বলেন কি! আমার এ জীবন আপনার কাছেই বাঁধা, আমি একশো বছর বাঁচতে চাই। ফাঁসি যাওয়াটা তো আমার কাজ নয়।'

তুজনের মধ্যে কথাবার্তাটা অবশ্য কিছুটা ঠাট্টা তামাশার স্তরেই অবশ্য রয়ে গেলো। আসলে ফ্রাগোসো মনে মনে সত্যিই দোআঁশলা মেয়েটার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলো। ব্যাপারটা লিনাও বুঝেছিলো, ওর দিকে ফ্রাগোসোর কারণে অকারণে মনযোগ দেবার ব্যাপারটাও লিনা লক্ষ্য করেছে। ও বেশ সরল আর সুপুরুষ। তুজনের মধ্যে অলক্ষ্যে একটু বন্ধুত্বের ভাবই জেগে উঠলো। বেনিতো, সিবিল আর অন্য সবার নজরেও তা পড়েছিলো।

এবার আবার সেই জাঙ্গাডার। আলাপ আলোচনা করে ঠিক হলো জাঙ্গাডাকে যতোদূর সম্ভব সুন্দর আর আরামদায়ক করে তুলতে হবে। গ্যারাল পরিবার—অর্থাৎ বাবা, মা, মেয়ে, বেনিতো, ম্যানোয়েল, চাকর-বাকরেরা সিবিল আর লিনা থাকবে আলাদা বাড়িতে। এরা ছাড়া থাকবে প্রায় জন চল্লিশ লাল মানুষ, চল্লিশজন কালা আদমী, ফ্রাগোসো আর বজরা চালাবার দায়িত্ব যার ওপর সেই চালক।

নাবিকদের সংখ্যা অবশ্য বেশি মনে হলেও প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশি নয়। নদীর অজস্র আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে চলতে আর কয়েক'শ ছোটোখাটো দ্বীপ ঘুরে চলার পথে বজরার সব মানুষেরই সাহায্য একান্তই অপরিহার্য।

প্রথম কাজই হলো বজরাখানার পেছনে পরিচালকের ঘর বানানো। এতে রইলো বেশ কতকগুলো শোবার ঘর আর মস্ত এক খাবার ঘর। একখানা ঘর ঠিক রাখা হলো জোয়াম আর তার স্ত্রীর জন্যে, অন্য আর একখানা লিনা আর সিবিলের জন্যে, ওরা থাকবে ওদের প্রভুপত্নীদের কাছাকাছি আর তৃতীয় ঘরখানা বেনিতো আর ম্যানোয়েলের জন্যে।

মিনার ঘর অন্য সকলের চেয়ে সামান্য একটু দূরেই, তা বলে আরামের একটুও কমতি নেই ওটায়।

এই-ই হলো প্রধান বাসগৃহ। জল-হাওয়ার অবস্থা বুঝেই এগুলো বানানো হলো—সমস্ত অংশটাই ফুটন্ত রজনে মাখিয়ে নিশ্ছিদ্র করা হলো। আলো হাওয়া খেলবার জন্যে জানালায় সারসিও বসিয়ে দেওয়া হলো। সামনের দিকে ঢোকবার দরজা দিয়ে বেরুলেই ঢোকা যায় বসার ঘরে। হাল্কা বাঁশে তৈরী ছোট একফালি বারান্দায় বাইরের দিকে সূর্যের আলো ঠেকিয়ে রাখার ব্যবস্থাও করা হলো। সবটাই রাঙিয়ে তোলা হলো হালকা গেরুয়া রঙে।

এবার মোটামুটি বড়ো কাজ শেষ হয়ে যেতেই মিনা বাবার কাছে এগিয়ে এলো।

'বাবা, তোমার কাজ তুমি তো শেষ করে ফেলেছো, এবার আমাদের থাকার সব বন্দোবস্ত কিন্তু আমি করবো, বুঝেছো। মা আর আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে তোমার মনে হবে ফ্যাজেনডাটাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।'

'তোর যা ইচ্ছে তুই কর,' একটা ব্যাথাতুর হাসি খেলে গেলো জোয়াম গ্যারালের মুখে।

'ঠিক জানতাম তুমি একটুও আপত্তি করবে না।'

'তোর রুচির ওপর আমার বিশ্বাস আছে মা। তোর হাতেই সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছি।'

'সত্যিই আমি দারুণ খুশি বাবা। তোমার নিজের দেশে যাচ্ছি—সব কিছু তাই বেশ ভালো করেই করতে হবে, তোমার একটা সম্মান আছে যে। কতোদিন বাদে নিজের দেশে যে ফিরছো তুমি।'

'ঠিক বলেছিস', জোয়াম উত্তর দেয়, 'মনে হচ্ছে যেন কতোকালের স্বেচ্ছা নির্বাসনের পর ফিরে চলেছি।'

ফ্যাজেনডার সেরা আসবাবপত্র ভেতরে এনে সাজানো হলো। টেবিল, বাঁশের তৈরী আরাম-কেদারা, বেতের সোফা, খোদাই করা কাঠের

তাক ইত্যাদিতে ভাসমান বাড়িটা রুচির সঙ্গে সাজিয়ে তোলা হলো। মেঝেয় পাতা হলো জাগুয়ারের চামড়া। হলুদ রঙের রেশমী কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো জানলাগুলোয়। বালিশ, তোষক, সবকিছুই উত্তর আমাজনের 'বম্ব্যাক্স' তুলোয় বানানো হলো।

তাকের সমস্ত অংশ জুড়েই নানা টুকিটাকি জিনিস সাজানো। এর কোনোটা বা রিও-ডি জানেরা বা বেলেম থেকে আনা। মিনার কাছে এগুলো মহামূল্যবান। সবই ম্যানোয়েলের দেওয়া উপহার। এগুলো যেন নীরবতার মধ্য দিয়েই দয়িতের প্রেম জানাতে চায়।

বাইরের অংশও কম সুন্দর হলো না। এখানে পড়েছিল কয়েকটা তরুণ হাতেরই দীর্ঘপরশ—এর সঙ্গে মিলেছিলো কিছু কল্পনার প্রলেপ আর রুচি।

নিচের থেকে ছাদ পর্যন্ত লতাপাতার প্রলেপ। অর্কিড, ব্রোমেলিয়া আর ফুলে ভরা লতা গাছের ঝোপে ঘেরা হলো সারা বাড়িখানা। আঁকা-বাঁকা লতাগুলোয় থোকায় থোকায় লালচে, বাদামী আর হলুদ ফুল। বিরাট একটা আঙুরলতা পাক খেয়ে সারা বাড়িখানা চমৎকার করে ঘিরে রেখেছে—কখনও দরজার পাশ দিয়ে, কখনও বা ছাদের পাশ থেকে নেমেছে লতাটা—পুরোপুরি সেই অরণ্যেরই স্বাদ যেন চারপাশে।

মিনার নজর কেড়ে নেবার জন্যেই ওর জানলার সামনে বাঁকা একটা হাতের মতো একগুচ্ছ ফুলে ভরা লতা ঝুলে আছে। কাজটা যে কার তা বোধ হয় না বললেও চলে।

সমস্ত ব্যাপারটাই এক কথায় অনবদ্য, চমৎকার। ইয়াকুইটা, তার মেয়ে আর লিনা দারুণ খুশি।

'জাঙ্গাডার ওপর বড়ো বড়ো গাছ বসাতেও এবার অসুবিধে হবে না,' বেনিতো বলে।

'অ্যাঁ! গাছ বলো কি!' মিনা অবাক হয়ে গেলো।

'অবাক হচ্ছো কেন?' ম্যানোয়েল বলে, 'মোটা কাঠের পাটাতনের ওপর বেশ কিছু মাটি ফেলে গাছগুলো লাগাতে পারলে আমার মনে হয় চমৎকার হয়।

'গাছ, লতা আর ফুল,' সত্যিই চমৎকার হবে, মিস মিনা,' ফ্রাগোসা বলে।

'ম্যানোয়েল আমাকে যে ফুলের তোড়া দিয়েছে তাতেই আমি খুশি —,' লতাপাতায় ঢাকা বাড়িটার দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলো মিনা,' দেখছো না, ভালোবাসার আলোয় ও কেমন সব কিছুই ঢেকে দিয়েছে!'

॥ নয় ॥ পাঁচই জুনের সন্ধ্যা

জ্যোয়াম গ্যারাল খুবই ব্যস্ত। বাইরের ঘর বানাতে হচ্ছে—ওগুলো হলো রান্নাঘর, অফিস ঘর আর দরকারী জিনিসপত্র রাখার ঘর। এগুলোতেই রাখা হবে সমস্ত দরকারী মালপত্র।

প্রথমেই চাই অপর্যাপ্ত পাঁচ থেকে দশ ফিট সাগু গাছের মূল। এগুলো থেকেই তৈরী হবে চমৎকার রুটি—গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। এর মধ্যে এক ধরনের বিষাক্ত জারকরস থাকে—আগে তাই রসটা বের করে নিতে হয়। পরে শুকনো করে ময়দা করে নেওয়া হয়। জাঙ্গাডায় অজস্র এই মূল জমিয়ে রাখা হলো সকলের ব্যবহারের জন্যে।

সকলের জন্যে আর দরকার জমানো মাংস। সামনে একটা বানিয়ে তোলা খোঁয়াড়ে অনেক ভেড়া নেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেলো—আর এ ছাড়া নেওয়া হলো এ অঞ্চলের শুয়োরের মাংস। চমৎকার স্বাদ ওই মাংসের। এ ছাড়াও হঠাৎ প্রয়োজনের তাগিদে সঙ্গে রইলো তরুণ বন্ধুদের আর লানমানুষদের কিছু বন্দুক। শিকার করায় ওদের সত্যিই জুড়ি মেলেনা—নদী তীরের দুপাশের অরণ্যে শিকার যোগ্য প্রাণীরও অভাব নেই। নদীর জলে ছড়ানো আছে অজস্র চিংড়ি মাছ। আরও রয়েছে 'টাম্বাগাস' মাছ—স্যামন মাছের চেয়েও এর স্বাদ অপূর্ব! 'পিরান্হা' বা শয়তান মাছেরও কমতি নেই—লাল দাগে ভরা ত্রিশ ইঞ্চি লম্বা মাছগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে ঘোরে। আর আছে কাছিম— অজস্র লাখে লাখে—স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে দারুণ প্রিয়।

আর চাই পানীয়। জাঙ্গাডা বোঝাই করে অতএব নেওয়া হচ্ছে দেশের সেরা পানীয় 'কেস্থমা' আর 'মাকাচেরা' মদ। এগুলো বানানো হয় মিষ্টি গাছের মূল জলে ফুটিয়ে নিয়ে। তাছাড়া রইলো ব্রাজিলের সব সেরা 'বিজু' আর পেরুর 'চিকা'। কলাগাছের এক রকম বীজ গুঁড়িয়ে বানানো হলো আর এক পানীয়। পলিনিয়া গাছের বীচি থেকে বানানো হলো চকোলেটের মত বড়ি—গুঁড়ো করে বানালে যার থেকে হয় চমৎকার স্বাদের গরম পানীয়। আর রইল তালের রসের স্থরা।

জাঙ্গাডার বিশেষ ঘরগুলোর দায়িত্ব পড়লো বেনিতোর ওপর। ঘরগুলোর বোঝাই করা শেরী, পোর্ট আর ব্রাণ্ডির স্থনাম সেকালের দক্ষিণ আমেরিকার বিজয়ীদের কথাই মনে করাতে চায়—এগুলো ছিলো তাদেরও প্রিয়। খানসামার দায়িত্বে রইলো এক গ্যালনের পাত্রে ভরা চমৎকার 'ষ্টাফিয়া' স্থরা। এবার তামাক নেওয়া হলো মধ্য আমেরিকার 'ভিলা বেলার' সব সেরা তামাক। স্বাদে গন্ধে যা সত্যিই অপূর্ব।

সকলের থাকার প্রধান জায়গা—রান্নাঘর, অফিসঘর আর গুদাম ঘর রাখা হলো পেছনের দিকে। জাঙ্গাডার মাঝ বরাবর তৈরী হলো ইণ্ডিয়ান আর কালো মানুষদের ঘর। ফ্যাজেনডারই কায়দায়।

অতো মাঝি মাল্লার থাকার বন্দোবস্ত করতে প্রয়োজন অনেকগুলো মাটির তৈরী ঘর। সেটা তৈরী হতেই জাঙ্গাডাকে সত্যিই অদ্ভুত দেখাতে লাগলো মনে হচ্ছে একটা পুরোপুরি ভাসন্ত গ্রামই যেন।

ইণ্ডিয়ানদের জন্যে জোয়াম গ্যারাল বিশেষ বন্দোবস্ত করলো। ওদের জন্যে বানানো হলো দেয়ালবিহীন ঘর বা কেবিন। খুঁটির ওপর ভর করে রইলো এর চাল বা ছাদ। চারদিক খোলা মেলা। কালা আদমীদের ব্যবস্থা একটু আলাদা। তাদের জন্যে ঘরই বানাবার ব্যবস্থা হলো। ঘরগুলোর চারপাশ ঢাকা—সামনে রইলো দরজা সমস্ত ঘরের সামনে।

জাহাজের সামনের অংশে বানানো হলো গুদাম ঘরের সারি। এর মধ্যে জোয়াম গ্যারাল বোঝাই করে নিলো নানা পসরা—সবই নেওয়া

হবে বেলেমে। প্রথমেই তোলা হলো সাত হাজার 'অ্যারোবা' অর্থাৎ সওয়া ছুলাখ পাউণ্ডের দামী রবার—এর প্রতি পাউণ্ডের দাম তিন থেকে চার ফ্রাঁ। আরও নেওয়া হলো পঞ্চাশ হন্দর সার্সাপারিলা—এই বিরল লতাগুলো খুব মূল্যবান বিদেশী বানিজ্য। আরও রইলো রঙ করার এক ধরনের গাছগাছড়া, নানা ধরনের আঠা, কিছু দামী কাঠ—এর সবগুলো মিলেই তৈরী হলো বানিজ্যের চমৎকার পসরা—খুব লাভে আর সহজেই এগুলো বিক্রী হবে প্যারায়।

ব্যাপারটা হয়তো আশ্চর্য লাগতে পারে,—আচমকা নদী তীদের ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে আরও সঙ্গী কেন নেওয়া হলো না।

এর দরকার হয় না। মধ্য আমেরিকার লাল মানুষদের ভয় পাবার মতো কিছু নেই—দিনকাল বদলে গেছে। নদী তীরবর্তী ইণ্ডিয়ানরা এখন খুবই শান্তিপ্রিয় গোষ্ঠিরই মানুষ—ওদের মধ্যে যাঁরা হিংস্র তারা সভ্যতার এলে নদীতীর ছেড়ে আরও অরণ্য গভীরে চলে গেছে। ভয় পাবার কারণ শুধু ব্রাজিল, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের উপনিবেশ গুলোয় শাস্তিপ্রাপ্ত পালিয়ে বেড়ানে নিগ্রোদের। এদের দেখা মেলে নিষ্পাদপ সাভানা বা বনগুলোতেই।

অন্যদিকে, নদীর তীর বরাবর প্রচুর লোকালয়েরও অভাব নেই—শহর, গ্রাম আর আশ্রম অজস্র ছড়ানো আছে। চলার পথে কোথাও নিরবিচ্ছিন্ন শূন্যতা নেই—বিরাট অববাহিকা জুড়ে উপনিবেশের পর উপনিবেশ আছে। জাঙ্গাডার বর্ণনা শেষ করার আগে আর শুধু ছু-একটা কথাই বলার আছে। জাঙ্গাডার সামনের দিকেই বানানো হয়েছে পাইলটের কেবিন। জাঙ্গাডার ছুপাশে ঝোলানো নৌকার হুকের সাহায্যেই জাঙ্গাডাকে ভাসমান রাখা হয় বা পথভ্রষ্ট হলে ঠিক রাখার ব্যবস্থা হয়। এই ভাবেই নদীর ছু'পাশের যে কোন এক তীর বরাবর জাঙ্গাডাকে থামানোও চলে। এই সব কাজ করার জন্যেই পাইলটকে জাঙ্গাডার সামনের দিকেই বসে থাকতে হবে।

পাইলট নিঃশব্দে বিশাল এই যন্ত্রযানের মূল যাত্রী পরিচালক এ ছাড়াও আর একজন যাত্রী আছেন—তিনি হলেন এর আধ্যাত্মিক পরিচালক নাম্ পাদ্রী পাসান্‌হা। ইনি ইকুইটোর মিশনের কর্তা। জোয়াম গ্যারালের মত ধার্মিক পরিবারটি তাই খুব আগ্রহের সঙ্গেই তাকে ওদের ভ্রমণের সাথী করে নিয়েছে।

পাদ্রী পাসানহার বয়স প্রায় সত্তর বছর। মানুষটা উঁচুমনের ভগবৎ-প্রেমিক, খুব দয়ালু আর সাধাসিধে। তাছাড়া যেসব দেশে ধর্মের চ্যালাদের খুব সৎ বলে মনে হয় না—সে জায়গায় ওঁকে অনায়াসেই তাদের দলে ফেলা যায়, যেসব মহান ধর্মপ্রচারকেরা বিশ্বের হিংস্র বুনো মানুষদের দেশের গভীরে ঢুকে মানব সভ্যতার জন্যে অকাতরে অনেক কিছুই করেছেন।

প্রায় বছর পঞ্চাশ ধরে পাদ্রী পাসানহা ইকুইটোতে মিশনের কর্তা হয়ে বাস করেছেন। সকলেই দারুণ ভালবাসে বৃদ্ধকে—আর তার কারণও আছে। গ্যারাল পরিবারও তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করে। এই বৃদ্ধই একদিন গৃহকর্তা ম্যাগালহাইয়ের মেয়ের সঙ্গে ফ্যাজেনডার আগন্তুক লোকটির বিয়ে দেন। ছেলেমেয়েদের জন্মলগ্ন থেকেই তাদের পরিচিত তিনি—ওদের দীক্ষাও তাঁরই হাতে, শিক্ষাও। তাছাড়াও ওঁর ইচ্ছে ওদের বিয়েতে আশীর্বাদও করে যাবেন।

বয়স হওয়ায় বৃদ্ধ আর কাজকর্ম চালাতে পারছেন না। বিদায়ের ক্ষণও বুঝি এসে গেছে, তাই ইকুইটোতে তাঁর বদলে এক তরুণ যাজকেরও বন্দোবস্ত করা হয়ে গেছে। তাই প্যারাতে ফেরবার ব্যবস্থাই তিনি করে ফেলেছেন। জীবন প্রান্তের শেষ দিনগুলো ওখানে ঈশ্বর প্রেমিকদের জন্যে নির্দিষ্ট এক মঠে কাটানোই ওঁর বাসনা। তিনি তাই সঙ্গে চলেছেন। বেলেমে মিনা আর ম্যানোয়েলের বিয়ে তিনিই দেবেন।

পাদ্রী পাসানহার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা হলো। বুড়ো মানুষটির আরামের জন্যে ইয়াকুইটা আর তার মেয়ের যত্নের কোনরকম ত্রুটি রইল

না। বৃদ্ধ সম্ভবতঃ আগে এরকম আরামে তার দীন কুটিরে কোনদিন কাটাননি।

আর পাদ্রী পাসানহার শুধু কুটির থাকলেই হয় না—একটা ভজনালয়ও দরকারী। আর সেইজন্যেই জাঙ্গাডার মাঝখানে বানানো একটা ভজনায়—আর ঝুলিয়েও দেওয়া হলো একটা ঘণ্টা।

আমাজনের বুকে প্রমোদ ভ্রমণের এই হল মোটামুটি কাঠামো। শুভ মুহূর্তের আর দেরি নেই। ৫ই জুন সব ব্যবস্থাই শেষ হয়ে গেলো। এবার শুধু যাত্রা শুরুরই অপেক্ষা।

আগের দিন সন্ধ্যাতেই পাইলট পৌঁছে গেছে। লোকটির বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই। নিজের কাজ সম্বন্ধে দারুণ ওয়াকিবহাল—তবে শুধু দোষ, পাঁড় মাতাল। তা সত্ত্বেও জোয়াম গ্যারাল এর আগে বহুবারই নিজের ভেলা ওর সাহায্যেই বেলেমে পাঠিয়েছেন, কোনবারই পস্তাতে হয়নি।

তবে আরাউজো—অর্থাৎ সেই পাইলট কয়েক গ্লাস টাফিয়া না গিলে যেন চোখে কিছু দেখতেই পায় না। কয়েক গ্লাস গিলেই তবে কাজের নাম করে সে—কয়েকটা সুরায় ভরা বোতল তাই হাতের কাছে ওর থাকা চাই-ই।

আর দেরী নেই। জলের উচ্চতা কয়েকদিন ধরে বেশ উঠেছে। মিনিটে মিনিটেই জলের রেখা বাড়ছে। ভেলাটায় একটু দোলা লাগাতেই আর জলের সীমা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসান হতেই সকলের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেলো।

৫ই জুনের সন্ধ্যায় জাঙ্গাডার ভবিষ্যৎ যাত্রীরা নদীতীরে শ'খানেক ফুট উঁচু ফাঁকা জায়গায় জমায়েত হলো—সকলের মুখেই একটা অধীর প্রতীক্ষার ছাপ।

সবাই এসে দাঁড়িয়েছে—ইয়াকুইটা, তার মেয়ে, ম্যানোয়েল ভ্যাল্ডেজ, পাদ্রী পাসানহা, বেনিতো, লিনা, ফ্রাগোসো সিবিল আর কিছু পরিচারক।

ফ্রাগোসো তো নিজেকে কিছুতেই আর ধরে রাখতে পারছে না—খালি পাগলের মতই ছুটোছুটি করছে আর বলছে, 'নাঃ আর চিন্তা নেই, ওই তো ওটা ভাসছে। যাক এবার সবার বেলেমে যাওয়া নিশ্চিত হলো। আর চিন্তা নেই। আমাজনে আকাশ ভেঙে পড়লেও ওটা ভাসবেই ভাসবে।'

জোয়াম গ্যারাল অবশ্য এখানে নেই, সে রয়েছে জাঙ্গাডার উপরেই—সঙ্গে সেই পাইলট আর জনকয়েক মাঝিমাল্লা। শেষ মুহূর্তের কাছাকাছি কিছু কাজকর্ম সেরে নেওয়া দরকার বলেই জোয়াম গ্যারাল ব্যস্ত হয়ে আছে। জাঙ্গাডাটা তখনও মোটা কাছি দিয়েই বাঁধা—পাছে স্রোতের টানের সঙ্গে ওটা ভেসে যেতে না পারে।

বিকেল প্রায় পাঁচটা। ঠিক তখনই জলের রেখা গত রাতের চেয়েও বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে উঠলো—প্রায় এক ফুটই হবে। এখন শুধু জাঙ্গাডা ভাসার অপেক্ষা।

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ৬টার সময় আনন্দের জোয়ার বয়ে গেলো সকলের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত জাঙ্গাডা সম্পূর্ণ ভাসতে শুরু করেছে। নদীর খরস্রোত ওটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো ঠিক মাঝখানে। কিন্তু মোটা সেই কাছিগুলোয় বাঁধা থাকার জন্যেই ভেলাখানা শেষ অবধি তীরের কাছে একটা জায়গাতেই স্থির দাঁড়িয়ে ভাসতে সুরু করলো—আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পাদ্রী পাসানহা তার আশীষবানী জানাতে লাগলেন জাঙ্গাডাকে লক্ষ্য করেই—বিশাল জলযান এবার সাগরের বুকে ভাসতে চলেছে, যার ভবিষ্যৎ শুধু সর্বশক্তিমান ভগবানেরই হাতে।

॥ দশ ॥ ইকুইটো থেকে পেভাসে

ঠিক পরের দিন, জুন মাসের ছ'তারিখে জোয়াম গ্যারাল আর ওর সঙ্গীরা সকলেই ফ্যাজেনডায় যারা থাকবে সেই কর্মাধ্যক্ষ, ইণ্ডিয়ান আর নিগ্রোদের কাছ থেকে বিদায় নিলো। সকাল ছ'টার সময় সকলে এসে দাঁড়ালো নদী তীরে। এবার একে একে সব ভ্রমণার্থীরা উঠে পড়লো জাঙ্গাডায়। এরপর সবাই যে যার নিজের ঘরে আশ্রয় নিলো।

যাত্রার আর দেরী নেই—পাইলট আরাউজো নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় আগেই উঠে পড়েছে। মাঝিমাল্লারাও তৈরী হয়ে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বেনিতো আর ম্যানোয়েলের সঙ্গে জোয়াম গ্যারাল ব্যস্ত নঙ্গর তুলে নেবার কাজে।

এবারের কাজ পাইলটের। সে হুকুম দিতেই জাঙ্গাডা বেঁধে রাখা দড়ির বাঁধন আলগা করে ফেলা হলো—মাল্লাদের হুকুম দিতেই তারা একসঙ্গে লগি ঠেলতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে জাঙ্গাডায় লাগলো গতির স্পর্শ। স্রোতের বুকে বিশাল ভেলাখানা ভাসতেই তীরের বাঁ দিক ঘেঁষে স্থুরু হলো যাত্রা—-ডান পাশে পড়ে রইলো ইকুইটো আর পারীয়ান্টা দ্বীপ।

স্থুরু হলো যাত্রা—কে জানে কোথায় কখন এর সমাপ্তি। পারাতে না বেলেমে? সবই ভবিষ্যতের গর্ভে।

আবহাওয়া সত্যিই চমৎকার। মনোরম ঠাণ্ডা বায়ুর স্রোত রোদের তাপ স্তিমিত রেখে চলেছে, ভারী চমৎকার এই বাতাস। জুন জুলাই মাসে কয়েক শ লীগ দূরের গিরিশ্রেণী পার হয়ে বয়ে আসে এই বাতাস। জাঙ্গাডায় যদি পাল টাঙাবার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে এর গতিবেগও

অনেক বেড়ে উঠতো। কিন্তু নদীটির আঁকাবাঁকা সর্পিল গতিপথের জন্য ওরা বাতাসের এই সাহায্য নিতে পারছে না।

যে বিশাল সমতল জেলাগুলোর ওপর দিয়ে আমাজন বয়ে চলেছে, সেটা সত্যিই বিশাল, সীমাহীন—নদীর গতির পরিমাণ জানা তাই দুঃসাধ্য। এটা প্রতি লীগে এক ডেসিমিটারের চেয়ে বেশী হতে চায় না। এটা অবিশ্বাস্য রকম কম।

জাঙ্গাডা ধীর গতির জন্যেই নদীর স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। এছাড়াও নদীর চড়া, তাকেও বাঁচানো চাই। তাছাড়া রাত নেমে আসায় দারুণ অন্ধকারে গতিও হল কম। শেষ পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টায় পঁচিশ কিলোমিটারের বেশি পাড়ি দেওয়া গেলো না।

ক্রমে ন্যানে নদীর মোহনা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো। ওটা দূরে শুধু একটা অস্পষ্ট বিন্দুর মতোই জেগে রইলো। সুন্দর সুন্দর ছবির মত দ্বীপ কাটিয়ে নদীর মাঝখান দিয়েই ভেসে চলেছে জাঙ্গাডা। ইকুইটো আর পালকাল্লার মধ্যে এরকম অসংখ্য দ্বীপমালা ছড়িয়ে আছে।

কাজের ফাঁকে ইয়াকুইটা, লিনা আর সিবিলের সাহায্যে সবকিছু গুছিয়ে ফেলতে সুরু করলো, ইণ্ডিয়ান রাঁধুনিরাও রান্নার কাজে লেগে পড়লো।

বেনিতো, ম্যানোয়েল আর মিনা, ওরা তিনজনে পাদ্রী পাসানহার সঙ্গে জাঙ্গাডার ওপর পায়চারি করতে করতে কথাবার্তা বলছিলো।

'বলুন তো পাদ্রীমশাই,' বেনিতো বলে, 'এই যে আমরা চলেছি, এর চেয়ে আরামে আর কোন ভাবে ভ্রমণ করা সম্ভব?'

'না বাছা,' পাসানহা বেনিতোর কথার জবাবে বললেন, 'এতো সর্বস্ব নিয়ে যাওয়া।'

'তাছাড়া এ ভ্রমণে পরিশ্রমও হয় না,' ম্যানোয়েল বলে উঠল, 'এভাবে আমার তো মনে হয় হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেওয়া যায়। কোন কষ্ট নেই।'

'তাছাড়া,' এবার মিনা বলে ওঠে, 'আপনি যে আমাদের সঙ্গে

চলেছেন তার জন্যে কোনকিছু ভাবতে চাইছেন না তো? আপনার কি মনে হচ্ছে না বিরাট একটা দ্বীপের বুকে বসেই যেন আমরা নদীর বুকে ভেসে চলেছি—আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলেছে দ্বীপের বুকের তৃণ-প্রান্তর আর গাছপালা। শুধু—'

'শুধু কি?' পাদ্রীমশাই জানতে চাইলেন।

'শুধু, এই দ্বীপটা আমরা আমাদের নিজেদের হাতেই তৈরী করেছি; এ দ্বীপ আমাদের, আর কারো নয়। এটাই আমার সব থেকে প্রিয়। এ দ্বীপ আমার গর্ব!'

'হ্যাঁ মা। তা তোমাকে এই অহঙ্কার করার জন্যে মাপ করে দিলাম। তাছাড়া তোমাকে মা, ম্যানোয়েলের সামনে বকাবকি করার ক্ষমতাও আমার নেই।'

'উঁহু, তা না হয় হলো,' খুশিতে ফেটে পড়লো মিনা, 'কিন্তু আপনি ম্যানোয়েলকে শিখিয়ে দিন যাতে আমি দোষ করলে ও আমাকে শাসন করে। ও আমাকে যে দারুণ প্রশ্রয় দেয় সব সময়।'

'হুঁ, তাহলে তো ভালোই হলো মিনা, ম্যানোয়েল হাসতে থাকে, 'তোমায় একবার মনে করিয়ে দিই—'

'কি আবার মনে করিয়ে দেবে?'

'ফ্যাজেনডার লাইব্রেরীতে তুমি খুব ব্যস্ত হয়ে বইপত্র ঘাঁটছিলে আর আমাকে বলেছিলে উত্তর আমাজন সম্বন্ধে যা কিছু জানো আমাকে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলবে, মনে আছে?'

'হুঁ, এগুলো জেনে কি হবে?' মিনা মুখ তোলে।

'কথাটা অবশ্য ঠিকই বলেছো, এগুলো জেনে কি হবে?' বেনিতো জবাব দিলো, 'টুপি' ভাষায় দেওয়া দ্বীপগুলোর শ'খানেক নাম মনে রাখলে কোন কাজ হবে? মিসিসিপির দ্বীপগুলোর ব্যাপারে আমেরিকানরা ঢের বেশি পাকাপোক্ত—ওরা সব দ্বীপেরই একটা করে নম্বর দেয়।'

'হ্যাঁ, যেমনভাবে ওরা ওদের শহরের রাস্তাঘাটের নম্বর দেয়।'

ম্যানোয়েল বলে, 'সত্যি কথা বলতে কি, ওই নম্বর দেওয়া ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়—ছিঁটে ফোঁটাও এতে আর থাকে না।'

'ঠিকই বলেছো ম্যানোয়েল,' মিনা বলে, 'তবে দাদার কথাটাও ঠিক। তবে এই দ্বীপগুলোর সবকটার নাম জানলেও, আমাদের মহান এই নদীর সব দ্বীপগুলোই কিন্তু যাই বলো অপূর্ব। দেখো, বড়ো বড়ো আকাশ ছোঁয়া তালগাছগুলোর বিরাট পাতার ছায়ায় দ্বীপগুলো কেমন চমৎকার লাগছে!'

'ছোট্ট মেয়েটির আমার আজ দারুণ উচ্ছ্বাস দেখছি।' পাদ্রীমশাই বললেন।

'হ্যাঁ পাদ্রীমশাই, আমার চারপাশের সকলকে এমন খুশি দেখে আমার দারুণ ভালো লাগছে যে।'

ঠিক তখনই ইয়াকুইটার ডাক শুনে মিনা হাসতে হাসতে ছুটলো।

সেদিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে পাদ্রীমশাই বললেন, 'চমৎকার সঙ্গিনী হবে তোমার ম্যানোয়েল। এ বাড়ির সমস্ত আনন্দই তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে সন্দেহ নেই।'

'ছোট্ট বোনটি আমার,' বেনিতো জবাব দেয়, সত্যিই ওর অভাব আমাদের বড্ড বেশি করেই মনে হবে। তা যাই হোক ম্যানোয়েল, এখনও একবার ভেবে দেখো, তুমি যদি আমার বোনটিকে বিয়ে না করো তাহলে ও আমাদের কাছেই থেকে যেতে পারে।'

'তোমাদের সঙ্গেই ও থাকবে বেনিতো,' ম্যানোয়েল মৃদু হাসে, 'বিশ্বাস করো, আমার এমন একটা কথা বারবারই মনে হচ্ছে, আমরা সকলেই আবার বোধ হয় এক হয়ে যাবো।'

ভ্রমণের প্রথম দিনটা দারুণ আনন্দের মধ্যে দিয়েই কাটলো। প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন ভোজ, একটু ঘুম, একটু বেড়ানো, সব কিছুই এমন চমৎকার নিয়মে ঘটলো যেন জোয়াম গ্যারাল আর তার পরিবারের সকলেই ইকুইটোর সেই ফ্যাজেনডার বাড়িতেই আরামে কাটিয়ে চলেছে।

চব্বিশ ঘণ্টায় বাকালি, কোচিও, পুকালপ্পা, নদীগুলোর মোহনা বাঁ

দিকে রেখে আর ইটিনিকারি, মানিটি, ময়ক, টুকুয়া আর ওই নদীর নামের দ্বীপ ডান পাশে রেখে জাঙ্গাডা এগিয়ে চললো। রাত নেমে আসতেই আকাশের কোনে দেখা দিলো রূপোলী চাঁদের হাসি আর বিশাল ভেলাখানা আমাজনের বুক চিরে তর তর করে এগিয়ে চললো।

পরদিন ৭ই জুন। সকাল বেলাতেই জাঙ্গাডা পুকালপ্পা গ্রামের তীরে এসে পৌঁছলো। গ্রামটাকে নতুন ওরানও বলে অনেকে। পুরনো ওরান বাঁ দিকের তীর ঘেসে আরও লীগ পনেরো দূরে।

৭ই জুনের সারাটা দিন ধরেই জাঙ্গাডা নদীর বাঁ তীর ঘেসে বহু ছোটো ছোটো অনামী নদী কাটিয়ে ভেসে চললো।

সন্ধ্যার দিকে ওরা পৌঁছলো নাপো দ্বীপে। এর নামকরণ হয়েছে নদী থেকেই। নদীটা উত্তর-উত্তর পশ্চিম কোন থেকে বয়ে ক্রমে প্রায় ৮০০ গজ চওড়া মোহনায় আমাজনের বুকে মিশেছে। এরপর জাঙ্গাডা পৌঁছলো ছোট্ট ম্যাঙ্গোদ্বীপের কাছাকাছি—এখানেই নাপো নদী আমাজনে পড়ার আগে দুভাগে ভাগ হয়ে পড়েছে।

নদীর মুখে এসে দাঁড়ালো কিছু লালমানুষ অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান। বিশাল আকৃতি মাথায় কোঁকড়ানো চুল, নাকে তাল গাছের কাটি ফুঁড়িয়ে ঢোকানো, কানে কাঠের মাকড়ি। দলের সঙ্গে কিছু মেয়েও আছে। ওদের কেউ অবশ্য ভেলায় ওঠার ইচ্ছে প্রকাশ করলো না। কারও কারও ধারনা লোকগুলো নরখাদক। কথাটা সত্যিও হতে পারে—নদী তীরের বহু আদিম জাতই হয়তো তাই—ওদের সবার কথা আজ হয়তো জানাও যায় না।

কয়েক ঘণ্টা পর চোখের সামনে ভেসে উঠলো বেলা ভিস্তা গ্রাম। নদীর ঢালেই গ্রামখানা। চারদিকে ছড়ানো অজস্র গাছ—নজরে আসছে কিছু খড়ের ছাউনি ঢাকা কুটির।

এর ফাল চলতে চলতে সকলের নজরে পড়লো আমাজনের বুকে ছড়িয়ে থাকা অজস্র কালো জলের হ্রদ—এগুলোর সঙ্গে আমাজনের সরাসরি যোগও নেই। এগুলোর মধ্যে একটার নাম ওরান হ্রদ—খালের

মতো সরু পথ বেয়ে এতে জল ঢোকে—আকারেও এটা বেশ বড়ো।

দুদিন ধরে জাঙ্গাডা কখনও বাঁ তীর ঘেঁসে আবার কখনও বা ডান তীর ঘেঁসেই ভেসে চললো—সবটাই নির্ভর করলো স্রোতের টানের ওপর।

সত্যিই এক নতুন জীবনের স্বাদ বয়ে আনলো এই ভ্রমণ। অবিরাম ভেসে চলায় সকলেই অভ্যস্ত হয়ে পড়লো। জোয়াম গ্যারাল ভ্রমণের ব্যবসায়িক দিকটার সব কিছু ছেলের ওপর ছেড়ে দিয়ে সারাক্ষণই প্রায় নিজেকে ঘরে আবদ্ধ রেখে চিন্তা আর লেখার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলো। ওর লেখার বিষয় বস্তু ও কাউকেই জানালো না, এমন কি ইয়াকুইটাকেও না।

বেনিতোও কাজে ব্যস্ত রইলো। চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখাই ওর কাজ। ইয়াকুইটা, মিনা আর ম্যানোয়েল প্রায় সব সময়েই একসঙ্গে ভবিষ্যতের চিন্তায় মশগুল হয়ে রইলো। ঠিক যেমন ওরা আগেও ফ্যাজেনডায় প্রায়ই করতে চাইতো। আসলে জীবন ধরো এখানেও যেন একটুও বদলায়নি—সেই রকমই রয়ে গেছে। বেড়ানোর আনন্দ টুকু পরিপূর্ণ উপভোগ করার মতো সুবিধে বেচারি বেনিতোই পায়নি। যদিও ইকুইটোর জঙ্গল এখানে নেই – নেই সেই জঙ্গলের বন্য জন্তু, আগুতি, পেকারি আর জারিয়া, তাহলেও হাজারে হাজারে পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে জাঙ্গাডার বুকের ওপর দিয়ে। বেনিতোও সুযোগ মাতা বন্দুকের সদ্ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করে না—আর সকলের স্বার্থ দেখেই মিনারও আপত্তি হয় না এতে। কিন্তু ওই উড়ন্ত পাখির ঝাঁকে যখনই হাঠুরঙ বা হলুদ রঙের সারসের দেখা মেলে, বোনের মন বুঝেই বেনিতো তাদের দিকে আর হাত তোলেনা।

শেষ পর্যন্ত ওমাগুয়াস গ্রাম আর কাটিয়ে অ্যামরিয়াকু নদীর মোহনা পার হয়ে জাঙ্গাডা ১১ই জুন তারিখের সন্ধ্যায় পেভাসে পৌছে যেতেই তীরের কাছে নঙর ফেলা হলো।

রাত নেমে আসার আগে জাঙ্গাডা বেশ কয়েকঘণ্টা এখানে থেমে থাকবে বলে বেনিতো নেমে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাগোসোও নেমে পড়লো, তারপর দুজনে ছোটো জায়গাটার চারপাশের জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে চললো। হঠাৎ গোটা কতক গিনিপিগ আর এছাড়াও ডজন খানেক তিতির পাখিও নজরে পড়লো ওদের। ফলে থলে ভর্তি হতে দেরী হলোনা। দুজনে আবার ফিরলো জাঙ্গাডায়।

ভোরের নিশানা জেগে উঠতেই আবার জাঙ্গাডার যাত্রা সুরু হলো একটু পরেই এটা পার হয়ে গেলো ইয়াটিও আর কোচিকুইনাস দ্বীপ-ডান পাশেই পরে রইলো কোচিকুইনাস গ্রাম। অজস্র দ্বীপমালার মধ্যে দিয়ে ভেসে যাবার সময় বহু অজানা নদীও পার হয়ে গেলো জাঙ্গাডা।

॥ এগারো ॥ পেভাস থেকে সীমান্ত অঞ্চলে

বেশ কিছু ঘটনাবিহীন দিন কেটে গেলো। শান্ত নির্মল মেঘমুক্ত আকাশের তলায় জাঙ্গাডা বাধাহীন স্রোতে নির্ভয়ে ভেসে চললো—একবারও থামতে হলোনা। নদীর দুটো তীরকে যেন মনে হতে লাগলো নাট্যমঞ্চের অপস্য়মান পর্দা—চোখেরসামনে একের পর এক সেটা পরিবর্তিত হয়ে চললো। এ যেন এক বিচিত্র দৃষ্টি বিভ্রম, মনে হয় যেন ভেলাখানাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর দুপাশের তীরভূমিই সবেগে ছুটে চলেছে।

তীরের দিকে বেনিতো কোনরকম শিকারের সুযোগ পেলোনা—কারণ ভেলা নঙর ফেললো না, কিন্তু শিকারের অভাব পুষিয়ে নেওয়া হলো মাছ ধরে। নানা জাতের বিচিত্র মাছ ধরা হলো নাম—'পাকোস', সুরুবিস 'গামিটানা। অদ্ভুত স্বাদ মাছগুলোয়। কোনটার গায়ে লাল ডোরা আর কালো বিষাক্ত পাখনাও আছে।

আমাজনের বিশাল জলরাশির মধ্যে এ ছাড়াও আছে আরো বহু বিচিত্র জলজ প্রাণী, জাঙ্গাডা ভেসে চলার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাণীগুলিও স্রোতের টানে একসঙ্গে ভেসে চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরেই। এগুলোর মধ্যে ছিলো বিরাট আকারের পিরা মাছ। মাছগুলো দশ বারো ফিট লম্বা—গায়ে বর্মের মত আটকানো বড়ো বড়ো আঁশ। এ মাছের মাংস স্থানীয় মানুষেরা তেমন পছন্দ করে না। এ ছাড়াও জলের বুকে ছিল শ'য়ে শ'য়ে স্নুশুক।

১৬ই জুন জাঙ্গাডা তীরের কাছাকাছি কয়েকটা চড়ায় প্রায় ঠেকেই বিরাট সান পাবলো দ্বীপের কাছাকাছি এসে পৌঁছলো, আর পরদিন সন্ধ্যাতেই আমাজনের বাঁ তীরে মোরামোরাজ গ্রামে এসে পড়লো। চব্বিশ ঘণ্টা পরে আতাকোয়ারি বা কোচা নদীর মোহনা ঘুরে এগিয়ে চললো জাঙ্গাডা। তারপর জাঙ্গাডাখানা এসে পৌঁছলো মিশম অব কোচায়।

কোচার এই মিশনের কর্তা ছিলেন এক ফ্রান্সিস সাধু, পাদ্রী পাসান হার সঙ্গে তার সাক্ষাতের আগ্রহও প্রবল।

জোয়াম গ্যারাল ভদ্রলোককে খুব সাদরেই স্বাগত জানিয়ে খাবার টেবিলেও তাকে একটা আসনও ছেড়ে দিলো।

ওই দিন খাবারের ব্যবস্থাও করা হলো একেবারে রাজসিক। সবটাই ইণ্ডিয়ান এক পাচকের কৃতিত্ব। নানারকম সুগন্ধি শিকরের ঝোল, টম্যাটোর রসে মাখানো চমৎকার কেক, মুরগীর সুরুয়া আর ভাত, ভিনিগার মাখানো মশলার গন্ধে ভরপূর 'মালাগুয়েটা'। বেচারি গরীব পাদ্রীর আর দোষ কি—এতো খাদ্য দেখে তার লোভ সামলে রাখাই দায় হলো। তার ওপর ইয়াকুইটা আর তার মেয়ের অনুরোধ উপ-রোধের ঠেলায় বেচারি চোখে অন্ধকার দেখলেন। কিন্তু ফ্রান্সিস এই সাধু মানুষটির ওইদিন সন্ধ্যাতেই এক অসুস্থ ইণ্ডিয়ানকে দেখতে যাওয়ার কথা থাকায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে এবার উঠতেই হলো।

এবার আরাউজোর দিকে নজর ফেরানো যাক। দুদিন ধরে

লোকটা দারুণ ব্যস্ত। নদীর গর্ত এখানে ক্রমশই চওড়া হয়ে পড়ছে—দ্বীপগুলোও সংখ্যায় বাড়ছে আর এই সব বাধা পেয়ে নদীস্রোতেও দারুণ বেড়ে উঠছে। সকলের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ২০শে জুন সন্ধ্যায় ওরা পৌঁছয় নুয়েস্ত্রা-সেনোরা-ডি-লরোটো'য়।

লরোটো হলো ব্রাজিল পৌঁছানোর আগে নদীর বাঁ তীরে শেষ পেরু প্রদেশের শহর। এটা আসলে একটা ছোট্ট গ্রাম, গোটা বিশেক বাড়িই আছে এখানে, আঁকাবাঁকা ঢেউ খেলানো নদীর তীরে চোখে পড়ে শুধু শুধু গিরিমাটির রঙ-স্রোত।

প্রায় ১৭৭০ সালে যেসুইট মিশনারীরা এই মিশন স্থাপন করেছিলেন। এখানে যে টিকুমা লাল মানুষরা নদীর উত্তর দিকের অঞ্চলটায় বাস করে তাদের গায়ের রঙ তামাটে, মাথায় ঝোপরা চুল, মুখে লম্বা আড়াআড়ি দাগ—ঠিক যেন একটা চীনা টেবিলে আঁকিবুঁকি কাটা। ওদের কোমরে ঝোলে, স্ত্রী পুরুষ দুজনেরই সামান্য একটুকরো কাপড়। এদের মোট সংখ্যা শ'দুয়ের বেশি হয়তো হবে না।

লরেটোতে এরা ছাড়াও কিছু কিছু পেরু প্রদেশের সৈন্য আর দু তিন জন পর্তুগীজ ব্যবসায়ীও বাস করে—ওদের ব্যবসা হলো কাপড়, নোনা মাছ আর মার্সাপ্যারিলা।

জাঙ্গাডা থামার পর বেনিতো একবার তীরে নামলো—যদি সম্ভব হয় কয়েক গাঁট আঙুর লতা যদি কেনা যায়। জোয়াম গ্যারাল ব্যস্ত রইলো নিজের কাজে, কোন দিকে নজর দেবার ওর সময়টুকু পর্যন্ত নেই। ইয়াকুইটা, ওর মেয়ে আর ম্যানোয়েলও জাঙ্গাডাতেই থেকে গেলো। লরেটোর মশার অবশ্য দারুণ বদনাম—উত্যক্ত করতে এদের জুড়ি নেই।

ম্যানোয়েল দু এক কথায় ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলো।

'আমাজনের দুই তীরে যতো পোকামাকড় আছে তাদের সবগুলোই শুনেছি লরেটো গ্রামে এসে জড়ো হয়। মিনা তুমি ইচ্ছে হলে বেছে নিতে পারো, ছাই রঙের মশা না ওই লোমওয়ালা মশা,

গায়ক মশা, কালো বা লালচে মশা' যা তোমার খুশি। অবশ্য তুমি পছন্দ না করলেও ওরা তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না—কিছুক্ষণ পরে তোমাকে আর চেনাই যাবে না! আমার মনে হয় ক্ষুদে এই রক্তচোষারা, তীরের গরীব সৈন্যগুলোর চেয়ে অনেক ভালো ভাবেই ব্রাজিলের সীমান্ত পাহারা দিতে পারে।

'প্রকৃতিতে সবারই নাকি প্রয়োজন আছে,' মিনা বলে, 'কিন্তু মশাগুলো কি এমন কাজে লাগে।

'ওরা পতঙ্গ বিজ্ঞানীদের আনন্দ জোগায়,' ম্যানোয়েল জবাব দেয়,' এর চেয়ে আর ভালো কোন জবাব তো খুঁজে পাচ্ছি না।'

ম্যানোয়েল কথাটা লরেটোর মশাগুলোর ব্যাপারে অবশ্য নেহাত অগ্রাহ্য করার মতো নয়। বেনিতো যখন ওর কাজ সেরে আবার ফিরে এলো তার মুখে আর হাতে অজস্র অসংখ্য লাল লাল দাগ—জুতোর চামড়া ভেদ করে পায়েও ওই রকম অসংখ্য দাগ।

'শিগগিরই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে, বেনিতো বলে, 'না হলে এই হতভাগা মশার কামড়ে জাঙ্গাডায় আর কারো থাকার উপায় থাকবে না।'

'তাছাড়া ওদের সঙ্গে করে প্যারাতেও হয়তো নিয়ে যেতে হবে, ম্যানোয়েল হেসে বলে, 'সেখানেও ওদের দোসর নেহাত কম নেই।'

অতএব তাই-ই হয়। রাত কাটানোর ভয়ে জাঙ্গাডাখানা আবার ভেসে পড়ে মাঝ দরিয়ায়।

লরেটো ছাড়াবার পর আমাজন সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিম মুখো হয়ে আরাভা কুয়ারী আর উরুকুটিয়া দ্বীপের মধ্যে বয়ে চলেছে। জাঙ্গাডা এবার চললো কাজারু নদীর কালো জল ঘেঁসে—আস্তে পাস্তে কালো ওই নদীর জল আমাজনের শুভ্র জলরাশিতে এসে মিশেছে। ২৩শে জুন সন্ধ্যায় জাঙ্গাডা নিরাপদেই বিরাট জাহুমা দ্বীপের কাছে এসে পৌঁছলো।

বাঁ দিকে নদীর তীরে আর জাহুমা দ্বীপের গাছগুলো অন্ধকারের মধ্যে

একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছে। অস্পষ্ট আলো আঁধারিতেও যেন চিনে নিতে কষ্ট হয় না ছাতার মতো ছড়ানো কোপাহু গাছগুলো। আর কিছু ম্যাণ্ডি গাছ—এই গাছ থেকেই একরকম মিষ্টি দুধ বের করা হয়।

বাতাসে ভেসে আসছে পাখিদের কলধ্বনি। গাছের ডালে ডালে ঝোলানো বাবুই জাতের পাখির বাসা ; নিয়াম্বাস জাতের মুরগী—অপূর্ব তাদের কণ্ঠস্বর। দলে দলে উড়ে আসছে রঙীন ডানা ছড়ানো মাছরাঙা, বিরাট আকারের লাল কাকাতুয়া। কি অপূর্ব পাখিগুলোর ডানার রঙ।

জাঙ্গাডায় সকলেই যে যার জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে,—সকলেই বিশ্রামের পথ খুঁজছে। শুধুমাত্র অতন্দ্র প্রহরীর মত পাইলট নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষারত।

রাত আটটা। জাঙ্গাডার ভাসমান গির্জার ঘণ্টায় শোনা গেলো তিনবার ঘণ্টাধ্বনি। বারান্দায় বসে আছে পরিবারের সবাই। জুলাইয়ের গরমদিন, বাইরের হাওয়া সকলের মন ভরিয়ে তুললো।

প্রতিটি সন্ধ্যায় একই ব্যাপার। শুধু জোয়াম গ্যারালই শান্ত সমাহিত। অন্যান্য সকলের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। আলাপ আলোচনায় সকলের সময় কাটতে লাগলো।

দারুণ খুশি মিনা। সে চেঁচিয়ে বললো, 'আঃ! কি চমৎকার আমাদের আমাজন নদী, এর তুলনা জগতের কোথাও নেই এ আমি বাজি রাখতে পারি।'

'কথাটা খুবই সত্যি মিনা,' ম্যানোয়েল সায় দিলো, 'তবে কি জানো, আমি আবার এই মহৎ সৌন্দর্য্যটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। ওরেলানা আর লা কণ্ডামাইনের কথা মনে পড়ছে, ওরা কয়েক শ' বছর আগে যা বলে গেছে তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

'তবে কিছু বাড়াবাড়ি আছে,' বেনিতো জবাব দেয়।

'দাদা', মিনা কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে ওঠে, 'আমাদের আমাজনের নিন্দে করবে না বলে দিচ্ছি।'

'উঁহু, এর উপকথার সম্বন্ধে বললে নিন্দে করা হয় নাকি ?'

'ঠিক আছে। কিন্তু উপকথাগুলো তো খুবই সুন্দর।' জবাব দিলে মিনা।

'উপকথা কি রকম ?' ম্যানোয়েল প্রশ্ন করে, 'প্যারাতে তো এগুলো শুনিনি কখনও।'

'বেলেমের কলেজে তাহলে কি ছাই পাঁশ শিখেছো ?' হাসতে হাসতে বলে মিনা।

'এখন দেখছি সত্যিই কিছুই শেখায় না সেখানে।'

'হুঁ', মিনা গম্ভীর হয়, 'তাহলে তুমি এ গল্প জানো না যে আমাজনের মধ্যে একটা বিরাট 'মিন্‌হোকাও' নামের কুমীর মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে—আর সে যখন আসে তখন আমাজনের জল দারুণ বেড়ে ওঠে আর চলে গেলেই তা কমে যায় এমন প্রকাণ্ড ওটার আকার।'

'তুমি তাকে দেখেছো নাকি ?'

'কোথায় আর দেখলাম।' এবার জবাব দিলো লিনা।

'ভারি আপশোষের কথা।' ফ্রাগোসো জবাব না দিয়ে থাকতে পারলো না।

'আর সেই মৎস্য-কন্যার কথাটাও মনে রেখো,' মিনা বলে, 'সবাই বলে সে নাকি নদীর তীরে তীরে হেঁটে বেড়ায় আর কেউ যদি তার দিকে একবার তাকায় তাহলে আর রক্ষা নেই, সে তাকে জলের নিচে নিয়ে যায়।'

'মৎস্য কন্যা' কিন্তু আছে। কেউ অবশ্য তাকে আর দেখতে পায় না, দেখামাত্রই সে লুকিয়ে পড়ে,' লিনা বলে।

'ঠিক আছে, লিনা, ওকে দেখতে পেলেই আমায় দেখিও।' হেসে ওঠে বেনিতো।

'উঁহু আপনাকে দেখাই, আর সে আপনাকে জলের তলায় টেনে নিক আর কি! কখনও তা বলবো না মিঃ বেনিতো।'

'দেখেছো, লিনাও বিশ্বাস করে।' হেসে ফেলে মিনা।

'অনেকে আবার মানাও'র গাছের গুঁড়ির কথাও বিশ্বাস করে,' লিনার হয়ে বরাবরের মতো এবারও বলে ফ্রাগোসো।'

'মানাও'র গাছের গুঁড়ি আবার কি জিনিস ?' ম্যানোয়েল জানতে চাইলো।

'ওঃ, মিঃ ম্যানোয়েল শোনেননি বুঝি ?' কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে ফ্রাগোসো, 'অনেকে বলে অনেক কাল আগে টুঙ্গমা গাছের একটা গুঁড়ি বছরের ঠিক একই সময়ে নেগ্রো নদীতে ভেসে আসতো। মাঝে মাঝে ওটা থামতো মানাওতে, তারপর আবার এগুতো প্যারার দিকে। যে বন্দরেই ওটা থামতো আদিম মানুষগুলো ওটায় ছোট ছোট পতাকা লাগিয়ে দিতো। বেলেমে পৌঁছেই আবার ঘুরে ওটা আমাজন বেয়ে নেগ্রো নদীতে পড়তো। তারপর রহস্যময়ভাবে যে জঙ্গল থেকে ওটা আসে সেখানেই ফিরে যেতো। একদিন একটা লোক ওটাকে তীরে টেনে আনতে চাইতেই নদী খুব ক্ষেপে গেলো—তাই সে চেষ্টা ছেড়ে দিতে হলো। আর একবার এক জাহাজের কাপ্তেন হারখুন ছুঁড়ে ওটাকে গেঁথে ফেলতেই নদী দারুণ ক্ষেপে গেলো, শেষ পর্যন্ত দড়ি ছিঁড়ে ওটা কোথায় চলে গেলো।'

'শেষ পর্যন্ত ওটার কি হলো ?' প্রশ্ন করে লিনা।

'শেষ পর্যন্ত একবার পথ ভুল করেই গুঁড়িটা নেগ্রো নদীতে না গিয়ে আমাজনে গিয়ে পড়তেই আর ওটার খবর পেলো না কেউ।'

'ওঃ একবার যদি ওটাকে দেখতে পেতাম !' লিনা বলে ওঠে।

'ওটাকে যদি দেখতে পাই, তোমাকেই ওটার ওপর চাপিয়ে দেবো', বেনিতো বলে, 'ঘুরতে ঘুরতে তুমি জঙ্গলে হারিয়ে যাবে, বেশ সুন্দর একটা জলপরী হয়ে।'

'ওঃ বেশ মজাই হবে।' লিনা জবাব দেয়।

'যাক, উপকথার কাহিনী তো শোনা হলো,' ম্যানোয়েল বললো, 'তোমাদের নদীর উপযুক্তই বটে। তবে এর একটা ইতিহাস আমি জানি —বলতে পারতাম তোমাদের, কিন্তু শুনলে হয়তো দুঃখ পাবে। তাই—'

'ওঃ, মিঃ ম্যানোয়েল গল্পটা বলুন না, দুঃখের গল্প আমার খুব ভালো লাগে,' লিনা চেঁচিয়ে ওঠে।

'বেশ। এটা এক ফরাসী মহিলার গল্প। আঠারো শতকে তার দুঃখে এই নদীর তীর স্মরণীয় হয়ে উঠেছিলো। ১৭৪১ সালের এক অভিযানের সময় দুজন ফরাসী বুগুয়ের আর লা কণ্ডামাইন বিষুব রেখার কাছে কিছু মাপ নিতে যাওয়ার সময় তাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন একজন খুব মানী জ্যোতির্বিদ, গোডিন দ্য ওডোনাই। গোডিন দ্য ওডোনাই রওয়ানা দিলেন, কিন্তু একা নয়, তার যাত্রা পথের সঙ্গী হলো তার তরুণী স্ত্রী, ছেলেমেয়ে শ্বশুর আর শ্যালক। ভ্রমনার্থীরা বেশ আনন্দেই পৌঁছলো কুইটো'তে। সেখানে পৌঁছবার পর আচমকা মাদাম ওডোনাইয়ের জীবনে পরপর কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটলো—কয়েক মাসের মধ্যে তিনি কয়েকটি সন্তান হারালেন। ১৭৫৯ সালের শেষে গোডিন দ্য ওডোনাই যখন তার কাজ শেষ করে ফেললেন, তিনি কুইটো ছেড়ে রওয়ানা হলেন কেইনে'র দিকে। শহরটায় পৌঁছে তিনি তার পরিবারের সকলকে কাছে আনতে চাইলেন—কিন্তু ইতি-মধ্যে যুদ্ধ লেগেছে। ফলে তিনি পর্তুগীজ সরকারের কাছে মাদাম ওডোনাই আর অন্য সকলের জন্য বিনা খরচে ভ্রমণের জন্য এক আবেদন জানালেন। কি হলো জানো? বেশ কয়েক বছর কাটার আগে অনুমতি মিললো না। ১৭৬৫ সালে দেরী দেখে গোডিন তো ক্ষেপে ঠিক করলো আমাজন বেয়ে তিনি কুইটোতে স্ত্রীর খোঁজে যাবেন; কিন্তু হঠাৎ অসুখ হওয়ায় বেশ দেরী হয়ে গেলো। যা হোক। আবেদনটা বিফল হয়নি—মাদাম দ্য ওডোনাই জানতে পারলেন পর্তুগালের রাজা অনুমতি দিয়েছেন। তাই তিনি নদী বেয়ে স্বামীর কাছে যাবেন ঠিক করলেন। একই সময় উত্তর আমাজনের মিশনে একদল সঙ্গীর ব্যবস্থাও হয়ে গেলো। মাদাম দ্য ওডোনোই খুব সাহসী মহিলা ছিলেন, তাই ওই বিপদসঙ্কুল পথ সত্ত্বেও তিনি রওয়ানা দিলেন।'

'এটা তার স্বামীর প্রতি কর্তব্য, ম্যানোয়েল,' ইয়াকুইটা বলে ওঠে, 'আমি হলেও তাই করতাম।'

'মাদাম দ্য ওডোনাই,' ম্যানোয়েল আবার ওর কাহিনী স্থুরু করলো, 'তার ভাই, সন্তান আর একজন ফরাসী ডাক্তারকে নিয়ে কুইটোর দক্ষিণে বিও বাম্বা'তে এসে পৌঁছলেন। ওদের ইচ্ছে ছিল ব্রাজিল সীমান্তে পৌঁছানো, তাহলে হয়তো জাহাজ আর সঙ্গী মিলতে পারে। ভ্রমণটা প্রথম দিকে নিরাপদই ছিলো; আমাজনের শাখানদীতে ক্যানোয় চড়ে যাত্রা স্থুরু হয়েছিলো। কিন্তু বিপদ দেখা দিলো, কারণ দেশটায় বসন্ত রোগের দারুণ প্রাদুর্ভাব। পথ প্রদর্শকরা কদিন কাটাতেই কোথায় পালালো। শেষ অবধি যে লোকটা ছিলো সেও ওই ফরাসী ডাক্তারকে বাঁচাতে গিয়ে ডুবে মারা গেলো। তীরে না নেমে আর উপায় নেই—তাই সকলে তীরে নেমে লতাপাতায় ঢাকা একটা চালা তৈরী করলো। ডাক্তার এক নিগ্রোকে নিয়ে আগে আগে গেলেন। নিগ্রো বেচারা মাদামকে ছেড়ে প্রথমে যেতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত দুজনে রওয়ানা হলো। কয়েকদিন অপেক্ষার পরেও তারা ফিরলো না। আর তাদের দেখা পাওয়া যায় নি।

'এদিকে জমানো খাদ্য প্রায় শেষ। উপায় না পেয়ে বাকি সকলে একটা ভেলায় চড়ে বৃথাই নদী পার হতে গেলো। আবার তীরে এসে ওদের দুর্ভেদ্য জঙ্গল ভেঙেই শেষ অবধি চলতে হলো। অসহ্য কষ্ট। ওই মহীয়সী ফরাসী মহিলার প্রাণ ঢালা সেবা সত্ত্বেও একে একে সকলেই মরণের কোলে ঢলে পড়লো। কদিন পরেই ছেলেমেয়েরা, আত্মীয় স্বজন আর চাকরবাকর সকলেই মারা গেলো।'

'আহা কি দুঃখী মহিলা।' লিনা ককিয়ে উঠলো।

'শুধু মাদাম ওডোনাইই বেঁচে রইলেন,' ম্যানোয়েল বলে চললো, 'যে সমুদ্রের কাছে তিনি পৌঁছতে চাইছিলেন তার চেয়ে

মাত্র হাজার লী দূরেই ছিলেন তিনি। কিন্তু এখন আর তিনি সেই মা ছিলেন না—মায়ের বুক থেকে তার সন্তান হারিয়ে গেছে, নিজের হাতে তাদের তিনি কবর দিয়েছেন। তখন তিনি একরকম স্ত্রী, যার একমাত্র সাধ স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন। সারা দিন সারা রাত ধরে তিনি হাঁটতে লাগলেন—অবশেষে চোখে পড়লো সেই বাবানোমা নদী। কিছু সহৃদয় ইণ্ডিয়ান তাঁকে দেখতে পেয়ে মিশনে পৌঁছে দিলো—সেখানেই অপেক্ষা করছিলো সঙ্গীরা। একাই পৌঁছবেন তিনি, তার পিছনে পড়ে রইল কয়েকটা কবর। মাদাম ত্য ওডোনাই লরেটোতে পৌঁছলেন, কদিন আগে আমরাও সেখানে ছিলাম। ওই পেরুর গ্রাম থেকে তিনি আমাজন বেয়ে চললেন, যেমন আমরা চলেছি—তারপর দীর্ঘ উনিশ বছর পরে তিনি স্বামীর দেখা পেলেন।'

'সত্যিই হতভাগিনী।' মিনা বলে ওঠে।

'সব চেয়ে দুঃখের কথা, ভারী দুঃখীনি মা,' ইয়াকুইটা বলে।

হঠাৎ আরাউজো এসে দাঁড়ালো।

'জোয়াম গ্যারাল, আমরা রণ্ডে দ্বীপ পরে হয়ে চলেছি। সীমান্ত ছুঁয়েও চলেছি আমরা!'

'সীমান্ত!' জোয়াম জবাব দিলো।

আস্তে আস্তে, উঠে দাঁড়ালো জোয়াম গ্যারাল। তারপর জাঙ্গাডার একপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রণ্ডে দ্বীপের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। দ্বীপের বুকে আছড়ে পড়লো নদীর ঢেউ। আস্তে আস্তে নিজের কপালে একবার হাত বুলিয়ে নিলো জোয়াম—যেন পুরনো কিছু স্মৃতি ও মনে করতে চাইলো।

'সীমান্ত!' জোয়াম গ্যারালের কণ্ঠ দিয়ে অস্পষ্ট শব্দটা বেরিয়ে এলো। কিন্তু শুধু এক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই যেন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে মাথা তুললো সে। শেষ কাজটুকু সমাধা করতেই হবে।

॥ বারো ॥ ফ্রাগোসো কাজে নামলো

"ব্রাজা" (জ্বলন্ত অঙ্গার) কথাটা স্পেনদেশের বারো শতক থেকেই কথাটার চল। কথাটা 'ব্রাজিল' শব্দটা তৈরী করতেই ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ এক ধরনের কাঠ, যা থেকে লাল রঙ পাওয়া যায়। এর থেকে এসেছে ব্রাজিল নাম—দক্ষিণ আমেরিকার যে বিশাল দেশটার উপর দিয়ে বিষুবরেখা চলে গেছে। সেখানে ওই কাঠ অপর্যাপ্ত পাওয়া যায় বলেই এই নাম। সারা দেশটাই যেন গ্রীষ্ম প্রধান সূর্য কিরণে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতোই জ্বলতে থাকে।

ব্রাজিল গোড়া থেকেই পর্তুগীজদের দখলে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় সুরুতে আলভারেজ কাব্রাল নামের এক পাইলট এদেশ দখল করলেন—যদিও ফরাসী আর ওলন্দাজরাও এসে হাজির হলো। আসলে দেশটা পুরোপুরি তবুও পর্তুগীজই রয়ে গেলো। আজকের দিনে এদেশ মধ্য আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো দেশ আর এর মধ্যমনি হয়ে আছেন বুদ্ধিমান শিল্পী রাজা ডন পেড্রো।

ওখানকার ইণ্ডিয়ানদের সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিলো যুদ্ধ। সভ্যতা প্রসারের কাজেও এই যুদ্ধ খুবই ফলপ্রসু ছিলো। ইণ্ডিয়ানদের মতো ব্রাজিলীরাও যুদ্ধ সুরু করলো। ১৮২৪ সালে পর্তুগীজ ব্রাজিলের সাম্রাজ্য গঠনের ষোল বছর পর পর্তুগাল থেকে ফরাসীদের তাড়া খাওয়া ডন জুয়ান বলে একজন ব্রাজিলের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। এখন সমস্যা দাঁড়ালো ব্রাজিল আর পাশের রাজ্য পেরুর সীমানার ব্যাপার নিয়ে।

ইতিমধ্যে ব্রাজিলকে আমাজন থেকে ইণ্ডিয়ানদের হরণ করার কাজে বাধা দিতে হলো। একাজ বন্ধ করার একমাত্র পথ ছিলো

রণ্ডে দ্বীপকে কাজে লাগিয়ে ওখানে পাহারা বসানো। ব্যাস্‌ এই ভাবেই সমস্যার সমাধান হলো—আর ওই দ্বীপের মধ্যে দিয়েই দুটো দেশের সীমানা চলে গেলো। জায়গাটা টাবাটিঙ্গা শহরের একটু উত্তরে।

উত্তর দিকের নদীটা হলো পেরুর, এর নাম হলো ম্যারানন। আর নিচের দিকে এটি ব্রাজিলের, নাম হলো আমাজন।

ওই টাবাটিঙ্গায় ২৫শে জুন সন্ধ্যায় জাঙ্গাডা এসে পৌঁছলো। নদীর মুখে এটাই প্রথম ব্রাজিলের এক সহর। সন্ত পলের এক মিশনও আছে এখানে।

মাঝি মাল্লাদের বিশ্রাম দেবার জন্যে জোয়াম গ্যারাল এখানে ছত্রিশ ঘণ্টা থাকবে বলেই মনে স্থির করলো।

ইয়াকুইটা আর তার ছেলেমেয়েরা জাঙ্গাডায় বসে মশার কামড় খাওয়ার চেয়ে তীরে নেমে শহরটা একবার ঘুরে আসবে ঠিক করে ফেললো।

টাবাটিঙ্গার জনসংখ্যা মাত্র শ'চারেক, প্রায় সকলেই ইণ্ডিয়ান লালমানুষ। এদের মধ্যে অনেকেই আবার যাযাবর শ্রেণীর। এরা আমাজন আর এর শাখাগুলির তীরে তীরে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।

রণ্ডে দ্বীপের পাহারা বেশ কয়েক বছর হয় তুলে নিয়ে আসা টাবাটিঙ্গায় নিয়ে আসা হয়েছে। শহরটাকে তাই অনায়াসেই দুর্গ-শহর বলতে বাধা নেই—অবশ্য সৈন্যবল বলতে মাত্র ন'জন সৈন্য, সবাই প্রায় ইণ্ডিয়ান।

ত্রিশ ফিট উঁচু নদীর তীরে থাকে থাকে মাটি কেটে সিঁড়ির মতো করা আছে। এর ওপরেই সেই বামন দুর্গ। মাঝখানে দলপতির কুঁড়ে আর একটু দূরে বড়ো এক গাছতলায় সৈন্যদের ছাউনি। নদীর তীরে পাহারাদারের বাক্সের উপর ব্রাজিলের ছোট্ট পতাকা। আর চারটে কামান—হুকুম অমান্যকারী জলযান গুলোকে হঠাৎ দরকার পড়লে তীরে টেনে আনার জন্যেই রাখা আছে।

আসল গ্রাম সমতলভূমির একটু নিচেই। বেহড়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা। কয়েক মিনিট পথ চললেই এখানে পৌঁছনো যায়। ওখানেই ডজন খানেক তালপাতায় ছাওয়া ঘর বাড়ি।

২৬শে জুন সকালে গ্যারাল পরিবারের সকলেই গ্রামটা বেড়িয়ে আসবে বলে ঠিক করে নিলো। জোয়াম, বেনিতো আর ম্যানোয়েল অবশ্য এর আগে কোন কোন ব্রাজিলের সহরে এসেছে, কিন্তু ব্যাপারটা ইয়াকুইটা আর ওর মেয়ের পক্ষে একটু অন্য রকম। এই প্রথম ওরা ব্রাজিলের শহর দেখতে চলেছে।

এদিকে, ভবঘুরে এক নাপিতের মতো ফ্রাগোসো যদিও মধ্য আমেরিকার বহু দেশই ঘুরেছে। লিনা কিন্তু প্রভুপত্নীর মতো এই প্রথম ব্রাজিলের মাটিতে পা রাখতে চলেছে।

জাঙ্গাডা ছেড়ে তীরে নামার আগে ফ্রাগোসো একবার জোয়াম গ্যারালের সামনে এসে কিছু বলবে বলে দাঁড়ালো।

'মিঃ গ্যারাল', ফ্রাগোসো কথা সুরু করলে, 'প্রথম যেদিন ইকুইটোর ফ্যাজেনডায় এসেছিলাম, আপনিই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন—আপনিই এই হতভাগ্যের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন পরণের পোশাক—আপনার দয়ার তুলনা নেই—আমি—আমি আপনার কাছে যে কতো ঋণী—।'

'না, না ও কিছু না বন্ধু। কোন ঋণ তোমার নেই,' জোয়াম উত্তর দিলো, 'এসব কথা ভেবোনা—।'

'না, না ভয় পাবেন না।' ফ্রাগোসো তাড়াতাড়ি বাধা দিতে চায়, 'আমি কোন ঋণ শোধ করার কথা বলছি না। আমাকে কথাটা দয়া করে শেষ করতে দিন, আপনি আমাকে জাঙ্গাডায় আশ্রয় দিয়ে এই বেড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছেন—তাই তো আবার আমি ব্রাজিলের মাটিতে এসে দাঁড়াতে পারলাম—আর কোনদিনই হয়তো আমার এটা দেখা হতো না। ওই আঙুরলতা ছাড়া—।'

'এব্যাপারে লিনাকেই একমাত্র তোমার ধন্যবাদ জানানো উচিত,' জোয়াম উত্তর দিলো।

'তা জানি। সে কথা কোনদিনই ভুলবো না মিঃ গ্যারাল, কিন্তু আপনার এ দয়ার কথাও তো আমার ভোলা উচিত নয়। আমি তো জানি আপনার কাছে আমি কতোখানি ঋণী।'

'ওরা বলছিলো, ফ্রাগোসো,' জোয়াম বলে চলে, 'তুমি নাকি টাবাটিঙ্গাতেই থেকে যেতে চাও?'

'না, না, তা নয় মিঃ গ্যারাল, আপনি যখন বেলেম পর্যন্ত আমাকে আপনাদের সঙ্গী হতে অনুমতি দিয়েছেন, আমি সেখানে গিয়েই আমার জাতব্যবসা সুরু করবো ভাবছি।'

'বেশ, তা যদি তোমার ইচ্ছে হয় তাই করো। কিন্তু কি যেন বলতে চাইছিলে?'

'না, মানে বলতে চাইছিলাম পথে আসতে আসতে আমার কাজ কর্মে কোনরকম দোষ ত্রুটি দেখতে পেয়েছেন কিনা। হাতগুটোয় মরচে ফেলে লাভ কি বলুন—মানে পকেটে যদি সামান্য কিছু রেস্ত থাকে—যদি কিছু রোজগার করতে পারি মন্দ কি। জানেন তো, মিঃ গ্যারাল আমার মতো যারা নাপিত আর মিঃ ম্যানোয়েলের মান রেখেই বলছি, তার মতো যাঁরা ডাক্তার, তাদের উত্তর আমাজনের এরকম সব গ্রামে খদ্দেরের অভাব হয় না।'

'হ্যাঁ, ব্রাজিলীদের মধ্যে তা হয়তো হবে,' জোয়াম উত্তর দেয়, 'তবে আদিম মানুষদের মধ্যে—।'

'মাপ করবেন,' ফ্রাগোসো জবাব দেয়, 'আদিম মানুষদের কথাই ধরুন। আহা। বেচারিদের তো দাড়ি কামানোর উপায় নেই—প্রকৃতি এ ব্যাপারে বড়ো কৃপণ ওদের বেলায়। তবে চুলের কথা যদি বলেন, কায়দা করে আধুনিক হতে ওদের আপত্তি নেই। ওদের মেয়ে পুরুষ দুজাতের বুনোরাই কিন্তু খুবই ভালোবাসে চুল ছাঁটতে। আমি যদি একবার ওদের কুঁড়েগুলোর কাছাকাছি যাই তাহলে

দেখবেন ওরা সবাই এই 'কোঁকড়ানো সাঁড়াশি'র কাছে কিভাবে আসে। আগে দুবার এখানে এসেছিলাম—ওঃ আমার কাঁচি আর চিরুনি বাজিমাৎ করেছিলো তখন। তবে ইণ্ডিয়ান মেয়েরা ব্রাজিলের সুন্দরীদের মতো প্রত্যেক দিন চুল আঁচড়াতে চায় না। একবার চুল আঁচড়ে বাঁধলে একবছর আর তাতে হাত পড়ে না। বছর খানেক আগে একবার টাবাটিঙ্গায় এসেছিলাম। তাই বলছিলাম আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে এখানে আর একবার আমার হাতযশ পরীক্ষা করে দেখতাম—দুটো পয়সাও পকেটে আসতো।'

'তা হলে যেতে পারো, বন্ধু', ফ্রাগোসোর দীর্ঘ বকুনি শুনে হাসতে হাসতে বলে জোয়াম গ্যারাল, 'তবে তাড়াতাড়ি করো। আমরা টাবটিঙ্গায় একটা দিনই থাকবো।'

'এক মুহূর্তও নষ্ট করছি না,' ফ্রাগোসো বলে, 'কাঁচি-টাঁচিগুলো নিতে যা সময়—ব্যাস্ তারপরেই ছুটবো।'

'বেশ তাহলে দৌড়ও, ফ্রাগোসো। তোমার পকেটে টাকা বৃষ্টি হোক!'

'হ্যাঁ, স্যার। বৃষ্টিই বটে। আপনার অনুচরটির কিন্তু তাতে আপত্তি নেই।'

কথাটা শেষ করেই ফ্রাগোসো ছুট লাগালো পড়ি কি মরি করে।

কিছুক্ষণ পরে জোয়াম ছাড়া পরিবারের সকলেই তীরে নামলো। ইয়াকুইটা আর তার সঙ্গীদের দুর্গের সর্দার গরীব হলেও খুবই সমাদর করে অভ্যর্থনা জানালো। নিজের কুটিরে কিছু জলযোগের ব্যবস্থাও করলো সে। পাহারাদার সৈন্যরা আশে পাশে ঘোরা ফেরা করতে লাগলো।

সর্দারের দেওয়া আহার্য না নিয়ে ইয়াকুইটা সর্দার আর তার বউকে জাঙ্গাডায় নিমন্ত্রণ জানালো। ইতিমধ্যে ইয়কুইটা, মিনা আর লিনার সঙ্গে ম্যানোয়েল কাছাকাছি একটু ঘুরে আসবে বলে এগিয়ে চললো। বেনিতো রয়ে গেলো সর্দারের সঙ্গে খাজনার ব্যাপারে কথাবার্তা

বলবে বলে। সর্দারই একদিকে খাজনাদার আর সেনাবাহিনীরও কর্তা।

কাজ শেষ হয়ে গেলে অভ্যাস মতো বেনিতো বন্দুক হাতে নিয়ে কাছাকাছি জঙ্গলে ঢুকলো। ম্যানোয়েল এবার ওর সঙ্গী হয়নি। ফ্রাগোসোও জাঙ্গাডা ছেড়ে নেমেছে—তবে দুর্গের কাছাকাছি না গিয়ে ও গ্রামের পথেই গেছে বেহড়ের পথ ঘুরে। সৈন্যদের চেয়ে গ্রামের আদিম মানুষগুলোই ফ্রাগোসোর কাছে দরকারী। ওদের স্ত্রী পুরুষ দুদলই ক্ষৌরকারকে দেখলে অভ্যর্থনা জানাতে দ্বিধা করে না। আর এদের সকলকে হাসি খুশি ফ্রাগোসো ভলোই চেনে। ফ্রাগোসোকে তাই লতাপাতায় ঘেরা পথে আসতে দেখেই ওরা দলে দলে ওকে ঘিরে ফেললো। ফ্রাগোসোর হাতে তেমন কোন বড়ো কিছু ছিলো না—ছিলো শুধু ওর কাঁচি আর একটা বাটি। জিনিসদুটো অপূর্ব কৌশলেই ও সকলের নজরে আনার চেষ্টা করলো। ফলে যেন সারা পড়ে গেলো আদিম মানুষগুলোর মধ্যে।

সবাই এসে দাঁড়ালো ফ্রাগোসোকে ঘিরে—স্ত্রী পুরুষ, তরুণ তরুণী কেউ বাদ নেই। সবার চোখেই একটা অদ্ভুত মাদকতার ছায়া। ফ্রাগোসো আধা পর্তুগীজ আধা টিকুনিয়া ভাষায় সকলের মনোরঞ্জন করতে কার্পণ্য করলো না। আসলে ব্যাপারটায় আশ্চর্য হবার মতো কিছুই ছিলো না—শুধুই কথার ফুলঝুরি। মানুষের দুর্বলতার সব সুযোগটুকুই কৌশলী ফ্রাগোসো নিতে চাইলো।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র—সকলের একান্ত আপনার হয়ে গেলো ফ্রাগোসো। তখন তার খাতির দেখে কে। সবাই ওকে ধরে এনে একটা আসনে বসালো।

ফ্রাগোসো ওর হাতের কাজ সুরু করতে দেরী করে না। হাতের সঙ্গে মুখেও ছোটে কথার ফুলঝুরি। সরল মানুষগুলোকে জয় করতে বেশিক্ষণ লাগলো না ওর। তবে চুলের কাজ জানে বটে ফ্রাগোসো—বিদ্যুতের মতোই ওর হাত চলে। এক এক নিমেষে

কারো মাথায় গোলাকার বল, কারও বা মাথায় গুচ্ছ, কারো বা বেনী বানিয়ে দিতে ফ্রাগোসো সিদ্ধ হস্ত।

এর ফলে দুহাত ভরে উঠলো ওর রেইস মুদ্রায়। আমাজনের আদিম মানুষদের এটাই কেনা বেচার হাতিয়ার। ফ্রাগোসোর পকেটে সত্যিই টাকা বৃষ্টিই হতে লাগলো। ওর খুশি আর বাঁধ মানে না। ক্রমেই দলে দলে মানুষ এসে হাজির হতে লাগলো। ফ্রাগোসোর কথা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয় নি। শুধু যে টাবাটিঙ্গার মানুষগুলোই এলো তাই না, আশে পাশের টিকুনা আর মায়োরুনারাও এসে দাঁড়ালো।

মাঝখানে ব্যাপারটা এমনই দাঁড়ালো, যে ব্যস্ত ফ্রাগোসো জাঙ্গাডায় ফেরার ফুরসতই করে উঠতে পারলো না। শুধু এক ফাঁকে কিছু রুটি আর কাছিমের ডিম নিয়ে নিল ও।

॥ তেরো ॥ টরেস

সন্ধ্যা পাঁচটার সময়েও ফ্রাগোসো এক নাগাড়ে ওর কাজ চালিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে দু'একবার চিন্তাও যে করেনি তা নয় যে রাতটা এখানেই কাটাবে কি না। এখনও প্রচুর লোক আশা নিয়ে বসে আছে। তখনই এক অচেনা আগন্তুককে দেখা গেল সোজা এগিয়ে আসতে।

লোকটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে ফ্রাগোসোকে লক্ষ্য করলো। তারপর মনে মনে সন্তুষ্ট হয়েই আগন্তুক এসে দাঁড়ালো।

লোকটার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। দেহে বেশ সুন্দর ভ্রমণের পোশাক কিন্তু মুখের ঘন কালো এক গোছা দাড়ি আর লম্বা চুল দেখলেই

বোঝা যায় বেশ কিছুকাল ওগুলোয় কোন পাকা নাপিতের হাতের স্পর্শ পড়েনি।

'শুভ-দিন বন্ধু, শুভদিন,' ফ্রাগোসোর কাঁধে আলতো করে একটা চাপড় মেরে আগন্তুক বললো।

ফ্রাগোসো আদিম মানুষগুলোর অশুদ্ধ মেশানো ভাষার বদলে শুদ্ধ ব্রাজিলি ভাষায় কথা বলতে শুনে ঘুরে তাকালো।

'আমার দেশের মানুষ নাকি? এক জনকে পরিচর্যা করতে করতেই প্রশ্ন করলো ফ্রাগোসো।

'হ্যাঁ,' আগন্তুক জানায়,' তোমারই দেশের লোক। একটু সাহায্য চাই যে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এখনই হয়ে যাবে,' ফ্রাগোসো জবাব দেয়, 'এই মহিলাকে ছেড়ে দিয়েই দেখছি, একটু অপেক্ষা করুন।'

একটু পরেই ফ্রাগোসো হাতের কাঁচি নামিয়ে রেখে আগন্তুকের দিকে তাকালো।

'বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি, স্যার?'

'দাড়ি কামিয়ে চুলটা কাটো,' আগন্তুক জবাব দিলো।

'ঠিক আছে।' বলেই ফ্রাগোসো আগন্তুকের মাথার চুলে চিরুণি বসিয়ে প্রশ্ন করলো, অনেক দূর থেকে আসছেন নাকি?

'আমি ইকুইটোর কাছাকাছি থেকে আসছি।'

'আরে, আমিও তো তাই!' চেঁচিয়ে ওঠে ফ্রাগোসো, 'আমি আমাজন পাড়ি দিয়ে ইকুইটো থেকে টাবাটিঙ্গায় এসেছি। আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'কোন আপত্তি নেই,' আগন্তুক উত্তর দিলো, 'আমার নাম টরেস।'

কায়দা মাফিক আধুনিক কায়দায় চুল ছাঁটা শেষ করে ফ্রাগোসো এবার আগন্তুকের দাড়িতে হাত লাগায়। হঠাৎ আগন্তুকের মুখের

দিকে তাকাতেই থেমে পড়লো ফ্রাগোসো তারপর কাজ শুরু করেই মুখ খুললো।

'ওঃ! মিঃ টরেস, মনে হচ্ছে আপনাকে যেন চিনি। নিশ্চয়ই কোথাও আমাদের দেখা হয়েছে?'

'কই আমার তো মনে হচ্ছে না,' তাড়াতাড়ি জবাব দেয় টরেস।

'তাই হবে, সব সময়েই কেমন যেন ভুল করি,' কথাটা বলতে বলতেই ফ্রাগোসো হাতের কাজ শেষ করতে চললো।

এক মুহুর্ত পরে ফ্রাগোসোর অসমাপ্ত কথার জের টেনে টরেস কথা সুরু করে।

'ইকুইটো থেকে কি করে এলে?

'ইকুইটো থেকে টাবাটিঙ্গায়?

'তাই।'

'এক ভেলায় চড়ে। ভেলার মালিক তার পরিবারের সঙ্গে আমাজন পাড়ি দিচ্ছিলেন, দয়া করে আমাকে তার সঙ্গে নিলেন। মস্ত এক ফ্যাজেণ্ডার মালিক তিনি—।'

'ওঃ খুব বন্ধুর কাজই করেছেন দেখছি। টরেস জবাব দেয়, 'তা, তোমার ওই ফ্যাজেনডার মালিক আমাকেও সঙ্গে নেবেন বলে মনে করো?'

'আপনিও নদী পাড়ি দেবেন বুঝি?'

'ঠিকই ধরেছো।'

'কোথায় প্যারায়?'

'না, শুধু মানাও'তে। ওখানে কিছু কাজকর্ম আছে।'

'ভদ্রলোক খুবই ভালো—মনে হয় উনি খুশি হয়েই আপনাকে সঙ্গে নিতে পারেন।'

'তা তোমার ওই ফ্যাজেণ্ডার মালিকের নামটা কি?' টরেস প্রশ্ন করলো।

'জোয়াম গ্যারাল,' ফ্রাগোসো জবাব দের। তারপর নিজের মনেই বলে 'লোকটাকে আমি নির্ঘাত কোথাও একবার দেখেছি।'

টরেস নামক লোকটি আচমকা কথাবার্তা বন্ধ করার মানুষ নয় মোটেও। এক্ষেত্রে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়াই ওর পক্ষে লাভজনক বলেই ও আবার কথা বলতে শুরু করলো।

'তাহলে বলছো জোয়াম গ্যারাল আমাকেও বেড়াবার সুযোগ করে দেবেন?'

'আমার একটুও সন্দেহ নেই,' ফ্রাগোসো জবাব দিলো, 'আমার মতো গরীব মানুষের জন্যে উনি যা করেছেন সেই রকম আমার দেশের মানুষের জন্যেও করবেন বলেই তো মনে হয়।'

'জাঙ্গাডায় ভদ্রলোক একাই চলেছেন বুঝি?

'না,' ফ্রাগোসো জবাব দেয়, উনি পরিবারের সকলকে নিয়েই চলেছেন—খুব আমুদে মানুষ ওরা। এছাড়া সঙ্গে আছে ফ্যাজেন্ডার কর্মচারী একদল নিগ্রো আর ইণ্ডিয়ান। ওরা সব মাঝি মাল্লা।'

'খুব বড়োলোক উনি?'

'দারুণ বড়োলোক।' ফ্রাগোসো বলে, অনেক পয়সা। জাঙ্গাডার কাঠ আর ওর মধ্যে যা মালপত্র আছে, তাই যে কোন লোকের ভাগ্য ফেরাতে পারে।'

'তাহলে জোয়াম গ্যারাল আর তার পরিবারের সবাই কিছুক্ষণ আগে ব্রাজিল সীমান্ত পার হয়েছে, তাই না?'

হ্যাঁ,' ফ্রাগোসো জবাব দিলো, 'ওর স্ত্রী ছেলে, ওঁর মেয়ে আর মিস মিনার বাগদত্ত স্বামী।'

'আহা! ওঁর বুঝি একটা মেয়েও আছে? টরেস প্রশ্ন করলো।

'আছে বৈকি, অপূর্ব সুন্দরী।'

'বিয়ে হচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ,। খুব চমৎকার এক ছেলের সঙ্গেই,' ফ্রাগোসো জবাব

দেয়, 'বেলেমের সেনাদলের এক সার্জন—ভ্রমণটা শেষ হবার পরেই ওই বিয়ে হবে।

'বাঃ চমৎকার!' হাসিমুখেই বলে টরেস, 'তাহলে এটাকে বিয়ের যাত্রা বলতে পারো, কি বলো?'

'এ ভ্রমণ অবশ্য বিয়ে, আনন্দ আর ব্যবসার খাতির বটে?' ফ্রাগোসো বলে, 'মাদাম ইয়াকুইটা আর তার মেয়ে এর আগে কখনও ব্রাজিলের মাটিতে পা দেন নি, আর জোয়াম গ্যারালও বুড়ো ম্যাগাল হাইয়ের খামারে ঢোকার পর এই প্রথম সীমান্ত পার হলেন।'

'ওদের সঙ্গে কিছু চাকরবাকরও তো আছে?' টরেস আবার প্রশ্ন করে।

'আছেই তো,' ফ্রাগোসো জবাব দিলো—, 'বুড়ি সিবিল, গত পঞ্চাশ বছর ধরেই বুড়ি খামারটায় আছে, আর তাছাড়া সুন্দরী এক দো আশলা মেয়ে, লিনা। মেয়েটা মিস মিনার সখী। কি সুন্দর ওর যে স্বভাব। যেমন নরম মন, তেমনই চোখ দুটো। আর এক একটা ব্যাপারে ওর মাথা যা খোলে, বিশেষ করে কোন আঙ্গুরলতা যদি হয়—,' ফ্রাগোসো আপন মনেই কথাটা সুরে করতে চাইলো।

'তা তোমাকে কতো দিতে হবে?' টরেস এবার বাধা দিলো ফ্রাগোসোকে।

'কিছুই দিতে হবে না,' ফ্রাগোসো বলে ওঠে, 'বিদেশের সীমান্তে দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হলে কিছু কি নেওয়া যায়। না, না, কিছুই দেবেন না।'

'কিন্তু, তা কেমন করে হয়, টরেস বলে, আমার কিন্তু দেওয়াটা—।'

'ঠিক আছে, পরে হবে এখন। জাঙ্গাডায় চলুন, তখন।'

'কিন্তু যেতে পারবো কিনা কে জানে, আমি জোয়াম গ্যারালকে আমাকে সঙ্গে নেবার কথাটা বলতে পারবো না—।'

'না, না' কিন্তু করবেন না!' ফ্রাগোসো তাড়াতাড়ি বলে, 'আপনি যদি বলেন তা হলে আমিই আপনার হয়ে বলবো—আমার মনে হয় এ অবস্থায় আপনার সাহায্য আসতে পেরে উনি খুশিই হবেন।'

আর ·ঠিক তখনই ম্যানোয়েল আর বেনিতো খাওয়া-দাওয়ার পর সহরটা একবার ঘুরে দেখতে সামনে এসে দাঁড়ালো।

টরেস ওদের দিকে ঘুরেই আচমকা বলে উঠলো, 'দুজন ভদ্রলোক বাইরে এসেছেন, মনে হচ্ছে ওদের যেন চিনি বা কোন জায়গায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।'

'ওদের চেনেন,' ফ্রাগোসো আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'ঠিকই বলছি। প্রায় মাসখানেক আগে ইকুইটোর জঙ্গলে ওরা আমাকে দারুণ এক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলো।

'কিন্তু ওরা তো বেনিতো গ্যারাল আর ম্যানোয়েল ভ্যাল্ডেজ।'

'জানি। ওরা ওদের নাম বসেছিলো, কিন্তু ওদের যে এখানে দেখবো একবারও ভাবিনি।'

টরেস ওদের দিকে এগিয়ে যেতেই বেনিতো আর ম্যানোয়েল ওকে না চিনতে পেরে মুখ তুলে তাকালো।

'ভদ্রমহোদয়েরা বোধ হয় আমাকে চিনতে পারছেন না? 'টরেস প্রশ্ন করলো।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বেনিতো জবাব দিলো, 'মিঃ টরেস, ঠিক বলছি না? আপনি বোধ হয় ইকুইটোর জঙ্গলে একটা গুয়ারিবাকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছিলেন?'

'ঠিক বলেছেন.' টরেস জবাব দেয়, 'ছ' সপ্তাহ ধরে আমাজন বেয়ে পাড়ি দিচ্ছিলাম, ঠিক আপনাদের সঙ্গে সীমান্ত পার হয়েছি মনে হচ্ছে।'

'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশী হলাম,' বেনিতো বলে, 'আমার বাবার সঙ্গে ফ্যাজেনডায় দেখা করতে আসবেন কথা দিয়েছিলেন ভোলেন নি তো?

'না, না, ভুলিনি।'

'আমাদের নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করলেই পারতেন। কিছুদিন রওয়ানা হবার জন্যে অপেক্ষা করতে হলেও বিশ্রাম নিয়ে সীমান্তের দিকে আসতে পারতেন। এতো হাঁটতে হতো না তাহলে আপনাকে।'

'সে কথা ঠিক,' টরেস বলে।

'আমার দেশের ইনি অবশ্য সীমান্তের কাছে থাকছেন না, ফ্রাগোসো বলে ওঠে 'উনি মানাও'তে যাচ্ছেন।'

'তাহলে তো ভালোই হলো,' বেনিতো উত্তর দেয়, জাঙ্গাডায় এলে আপনার অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হবে না, আর আমার মনে হয় বাবা আপনাকে নিয়ে যেতে আপত্তি করবেন না।

'কোন আপত্তি নেই,' টরেস বলে, 'আগেই তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি।'

কথাবার্তায় ম্যানোয়েল কোন অংশ নিলো না। লোকটিকে মনযোগ দিয়ে শুধু লক্ষ্য করতে চাইলো। মুখখানা যদিও ওর মনে পড়লো না। চোখদুটোয় যেন সরলতার বেশ অভাব—প্রতি মুহূর্তেই দৃষ্টি সরাতে চায় লোকটা, যেন কোথাও বেশিক্ষণ নজর ফেলতে ভয় পাচ্ছে।

'আপনাদের অনুমতি পেলে আমি এখনই জাহাজ ঘাটায় যেতে রাজি আছি,' টরেস বলে।

'তাহলে আসুন,' বেনিতো আহ্বান জানালো।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে টরেস জাঙ্গাডায় এসে উঠলো। বেনিতো কথায় কথায় প্রথমে কিভাবে লোকটার সঙ্গে ওদের দেখা হয় জানিয়ে জোয়াম গ্যারালের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়ে-মানাও পর্যন্ত ওকে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানালো।

'আপনার সাহায্যে লাগতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত হলাম জোয়াম জবাব দিলো।

'ধন্যবাদ,' টরেস কথাটা বলেই হাতটা বাড়িয়ে দিতে গিয়েও দিলো না।

'কাল ভোরেই আমরা রওয়ানা হবো,' জোয়াম গ্যারাল বলে,' তাই আপনার জিনিসপত্র এখনই নিয়ে আসুন।

'ওঃ, তা করতে বেশিক্ষণ লাগবে না,' টরেস জবাব দেয়, 'আমি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই।'

'তাহলে বিশ্রাম করুন এবার।'

ওই দিন সন্ধ্যেবেলায় টরেস ফ্রাগোসোর কাছাকাছি একটা কেবিনে এসে ঢুকলো। ওই কেবিনেই ওর থাকার ব্যবস্থা হলো। রাত্রে প্রায় আটটার আগে ফ্রাগোসো অবশ্য ভেলায় ফিরলো না।

॥ চৌদ্দ ॥ আরো অবতরণ

পরদিন ২৭শে জুন, আলো ফুটে উঠতেই দড়ি দড়া খুলে আবার নদীর বুকে ভেসে পড়লো ভেলা—আবার সুরু হলো যাত্রা।

বাড়তি একজন যাত্রী এবার টরেস কোথা থেকে এলো আসলে কেউই কথাটা জানে না। ওর গন্তব্যস্থল ওরই কথা মতো মানাও'তে। ওর বিগত জীবনের সন্দেহজনক কোন কিছু যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় এর জন্যে টরেস দারুণ সাবধানী। কেউ তো জানে না জাঙ্গাডায় আশ্রয় নিয়েছে এক অরণ্য-সর্দার। জোয়াম গ্যারালকে বাড়তি কোন প্রশ্ন করে লোকটাকে বিব্রত করতে চায় নি।

ভেলায় আশ্রয় দিয়ে ফ্যাজেনডার মালিক মানবিকতার কিছু নিদর্শন রেখেছে। এ অঞ্চলে ভ্রমনার্থীর পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। টরেসও তাই করে চলছিলো। শেষ পর্যন্ত তাই করতেও হতো ভেলার যদি আশ্রয় না পেতো। এটা ওর নেহাত সৌভাগ্য যে ভেলায় আশ্রয় মিলেছে।

বেনিতো, কিভাবে ওর সঙ্গে লোকটার দেখা হয় বলতেই পরিচয়ের

পালা শোধ। টরেস এখন যেন এক আটলান্টিক গামী স্টিমারের যাত্রী—নিজের খুশি মতো চলতে যার কোন বাধা নেই।

প্রথম কয়েকদিন দেখা গেল টরেস গ্যারাল পরিবারের সঙ্গে বিশেষ মিশতে চায় না। ও নিজেকে একটু আলাদা রাখতে চায়। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় ও কিন্তু নিজে থেকে কোন প্রশ্ন একবারও করে না।

কারো সঙ্গে যদি ওর মন খুলে কথাবার্তা হয়, সে হলো ফ্রাগোসো। বহুবারই সে ইকুইটোতে গ্যারাল পরিবারের অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ করেছে, ম্যানোয়েল ভ্যালাডেজের প্রতি গ্যারাল কন্যার মনোভাব কেমন—অবশ্য সবটাই অত্যন্ত কৌশলেই জানতে চেয়েছে ও।

প্রাতরাশ আর আহারপর্ব জোয়াম গ্যারাল আর তার পরিবারের সঙ্গে সমাধা করলেও সে বড়ো একটা কথাবার্তায় অংশ নিতে চায় না।

সকালের দিকে ভেলা জাভারী নদীর মোহনায় চমৎকার দ্বীপ মালা পার হয়ে গেলো। নদীর মোহনা প্রায় তিন হাজার ফিট চওড়া। ৩০শে জুন সকাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলো না।

ওরা ইতিমধ্যে আরারিয়া দ্বীপ পার হলো, এ ছাড়াও ক্যালাডেরন দ্বীপ আর অন্যান্য বহু দ্বীপমালা। এর অনেকগুলোই এখনও ভূ-বিজ্ঞানীদের নজরে আসেনি।

৩০শে জুন ওরা ওখানেই থেমে রইলো। ম্যানোয়েল আর বেনিতো কাছাকাছি শিকার করতে গিয়ে কিছু পাখি নিয়ে এলো। তাছাড়াও ওরা এমন একটা জন্তুও সঙ্গে আনলো যেটা বাবুর্চীর চেয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরাই আগ্রহ জাগাতো।

প্রাণীটা গাঢ় রঙের, কিছুটা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের কুকুরের মতো।

'ওঃ এটা একটা বিরাট পিপীলিকাভুক।' বেনিতো জন্তুটাকে জাঙ্গাডার উপর ছুঁড়ে ফেলে বলে ওঠে।

'চমৎকার নমুনা,' যাদুঘরে রাখার মতোই,' ম্যানোয়েল সপ্রশংসস্বরে বলে।

'আশ্চর্য জন্তুটাকে ধরতে খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি?' মিনা প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁরে বোন', বেনিতো বলে, 'তুই তো আর ওখানে ওর হয়ে দয়া চাইতে যাসনি। কুকুরগুলোর জান খুব শক্ত—তিন তিনটে গুলি খেয়ে তবেই ওটা পড়েছে।'

২রা জুলাই সকালে জাঙ্গাডা সুন্দর বৃক্ষঘেরা অরণ্যময় অজস্র দ্বীপ পার হয়ে মান পাওলো দ্য' অলিভেন্সা'র কাছাকাছি এসে পৌছলো। সারা ঋতুতেই দ্বীপগুলো শ্যামলিমায় ঘেরা থাকে। এদের কোনটার নাম রিটা, মারা কারাটেনা আর কুরুরু মাপো। এখানে নদীর জল খুব কালো।

এই জলের রঙের ব্যাপারটা বেশ একটু মজার। আমাজনের বেশ কিছু শাখানদীর ক্ষেত্রে রকম অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। এদের গুরুত্বও আলাদা।

ম্যানোয়েল ব্যাপারটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

'অনেকেই কিন্তু এই রঙের ব্যাপার নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। 'কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যা কেউ করতে পারেন নি আজও।'

'জলটা কিন্তু সত্যিই কালো, মধ্যে আবার সোনালী ঝলক', মিনা জাঙ্গাডার পাশে ভেসে চলা একটা লালচে-বাদামি কাপড়ের টুকরোর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

'ঠিক', ম্যানোয়েল আবার বলে, 'হামবোল্ডও এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে রঙটা আসলে কিন্তু সিপিয়া।'

'খুব ভালো।' বেনিতো চেঁচিয়ে ওঠে, 'তাহলে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধের আর একটা ঘটনা বাড়লো।'

'আমার মনে হয়', এবার ফ্রাগোসো নাক গলালো, 'ওদের এবার কুমীর আর শুশুকদের মত নেওয়া দরকার। প্রাণীগুলো কালো জলই বেশি ভালোবাসে।'

আগেই বলা হয়েছে ২রা জুলাই জাঙ্গাডা সান পাবলো দ্য' অলিভেন্সায় এসে পৌঁচেছে। এখানে পৌঁছে ওরা হাজার হাজার মালা

াবাক্রর বন্দোবস্ত করে ফেললো। মালাগুলো একজাতের মাছের আঁশ দিয়ে তৈরী। এ এক ভালো ব্যবসা।

এখানে পৌঁছনোর পর জোয়াম গ্যারাল ছাড়া সকলেই তীরে নামলো। টরেসও রয়ে গেলো—ওর সান পাবলো দ্য অলিভেন্সা দেখার কোন আগ্রহ দেখা গেলো না।

বেনিতোর পক্ষে কিছু ব্যবসা করে নিতে তেমন কঠিন হলো না। জাঙ্গাডার ভাঁড়ারে কিছু মালপত্রও জমা হলো। সরিবারের সকলেই শহরের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথেষ্ট সমাদর পেলো। ওখানকার শাসনকর্তা আর শুল্ক অধিকর্তার কাছ থেকে ব্যবসার ব্যাপারে কোন বাধাও এলো। বরং ওরা নিজেদের কিছু মাল তরুণ ব্যবসায়ীটির হাতে মানাও আর বেলেমে বিক্রীর জন্যে সঁপে দিলো।

শাসনকর্তা, তার সহকারী আর পুলিশের কর্তা জাঙ্গাডার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তারা পৌঁছতেই জোয়াম গ্যারাল উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গেই তাদের অভ্যর্থনা জানালো।

আহারের সময় টরেস অন্য সময়ের চেয়ে বড়ো বেশি বাচালতা প্রকাশ করে চললো। ব্রাজিলের একেবারে ভেতরে প্রমাণ করার অনেক কাহিনীইও শোনাতে লাগলো। ভ্রমণের কথা বলার ফাঁকে ও শাসনকর্তাকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে ভুললো না তিনি মানাও সম্বন্ধে জানেন কিনা। তার সঙ্গীরা সেখানে আছে কিনা—আর ওখানকার বিচারক, জেলার এক নম্বর শাসনকর্তা এই গরমের সময় গরহাজির থাকেন কি না। মনে হলো যেন প্রশ্ন করার ফাঁকে টরেস জোয়াম গ্যারালের মুখের দিকেই তাকাতে চাইছে। একটু আশ্চর্য হয়েই বেনিতো লক্ষ্য করলো। আর ও এটাও দেখলো ওর বাবা টরেসের প্রশ্নগুলো অত্যন্ত মনোযোগ দিয়েই শুনছেন।

সান পাবলোর শাসনকর্তা জবাবে জানালো ওখানকার কর্তৃপক্ষ মানাওতেই উপস্থিত আছে—লোকটি জোয়াম গ্যারালকে তাদের শুভেচ্ছা জানাবার দায়িত্বও দিতে চাইলো। সম্ভবহলে জাঙ্গাডা আর

সাত সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় ২০শে বা ২৫শে আগস্টের ভেতরেই সেখানে পৌঁছে যাবে।

ফ্যাজেনডার মালিকের মান্য অতিথিরা সন্ধ্যার দিকে বিদায় নিলো। পরদিন, ৩রা জুলাই সকালে নদীর বুকে আবার তার যাত্রা সুরু হ'লো জাঙ্গাডার।

॥ পনেরো ॥ অবতরণ

৫ই জুলাই সন্ধ্যা থেকেই আবহাওয়া বেশ ভারি হয়ে উঠলো—সকাল থেকেই চলেছে গুমোট, হয়তো ঝড় আসবে। আমাজনের ঢেউয়ের ওপর অসংখ্য বাদুর তাদের মস্ত ডানা ছড়িয়ে উড়তে সুরু করেছে। এদের কতকগুলোর রঙ গাঢ় বাদামী। মিনা আর লিনার একটুও ভালো লাগলো না।

জীবগুলো সাংঘাতিক সেই রক্তচোষা ভ্যামপায়ার বাদুর। গরু বাছুরের রক্ত শুষে নেয় জীবগুলো—মাঠে-ঘাটে মানুষ থাকলেও তাদেরও আক্রমণ করতে ছাড়ে না।

'ওঃ। কি সাংঘাতিক', লিনা দুহাতে চোখ ঢাকে, 'আমার দারুন ভয় করছে।'

'সত্যিই কি কুৎসিত ওগুলো, তাই না ম্যানোয়েল?' মিনা বলে।

'সত্যিই মারাত্মক জীব এগুলো', ম্যানোয়েল বলে, 'জীবগুলোর অনুভূতি শক্তি খুব প্রবল—কোথায় কামড়ালে সহজে রক্ত পাত হয় ওরা জনে। যেমন ধরো, কানের ঠিক পাশে। ওরা যখন রক্ত চোষে তখন প্রাণীদের ঘুম সহজে ভাঙতে চায় না। এমন কাহিনীও আছে রক্তক্ষরণ হতে হতে মানুষ মরণ-ঘুমে ঢলে পড়ে—যে ঘুম আর ভাঙে না।'

'আর বলো না এসব কথা, ম্যানোয়েল', ইয়াকুইটা বলে ওঠে 'মিনা আর লিনা বোধ হয় আর তাহলে ঘুমুবে না।'

'ভয় পাবেন না, দরকার হলে ওরা ঘুমুতে গেলে না হয় পাহারা দেবো।'

'চুপ!' বেনিতো হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো।

'কি ব্যাপার?' ম্যানোয়েল প্রশ্ন করলো।

'ওদিকে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাচ্ছো', দক্ষিণ দিকে হাত দেখালো বেনিতো।

'কিসের শব্দ ওটা?' মিনা জিজ্ঞাসা করে, 'মনে হচ্ছে যেন দ্বীপের তীরে কেউ পাথরের চাঁই টেনে নিয়ে চলেছে।'

'খুব ভালো! আমি শব্দটা কিসের বুঝতে পারছি', বেনিতো খুশি হয়ে উঠলো, 'কাল ভোরে, যারা কাছিমের ডিম আর বাচ্চা কাছিম ভালোবাসে তাদের খুব মজা হবে।'

বেনিতো ভুল করেনি। শব্দগুলো আসছিলো হাজার হাজার ছোট কাছিমের কাছ থেকে। ওরা দ্বীপের বুকে ডিম পাড়তে আসে। দ্বীপের বালির গর্তে প্রাণীগুলো সূর্যাস্ত থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত ডিম পাড়ে।

ডিম পাড়ার ব্যাপারটা বেশ মজার। সর্দার কাছিম সর্বপ্রথম একটা জায়গা বেছে নিতে এগিয়ে আসে। তারপর হাজারে হাজারে কাছিম আসতে সুরু করে। তারপর পেছনের পা দিয়ে প্রায় ছ'শ ফিট লম্বা বারোফিট চওড়া আর ছ'ফিট গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে ওরা তার মধ্যে ডিম পাড়ে। পাড়া হয়ে গেলে তা বালি দিয়ে ঢেকে দেয়।

আমাজন আর এর শাখাগুলোর নদীতীরের ইণ্ডিয়ানদের কাছে এই ডিম পাড়ার ব্যাপারটা খুবই উৎসাহের ব্যাপার। ওরা কাছিম-গুলোর অপেক্ষায় থাকে, তারপর ঢাক পিটিয়ে ডিমগুলো তুলে নেয়। এবার ওরা ভোজ আর নাচগানে মত্ত হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালে বেনিতো, ফ্রাগোসো আর কয়েকজন ইণ্ডিয়ান একটা ছোট পানসি চড়ে দ্বীপে এসে নামলো। জাঙ্গাডা থামাবার প্রয়োজন হলো না—ওরা অনায়াসেই সেটাকে ধরতে পারবে।

দ্বীপের বুকে ছোট ছোট ঢিবি দেখেই ওরা বুঝলো ওর মধ্যেই ডিম পাড়া হয়েছে। ওরা অবশ্য ওদিকে নজর দিলো না। দুমাস আগে আর এক জায়গায় ডিম পাড়া হয়েছিলো। রোদ্দুরের তাপে ডিম ফেটে হাজার হাজার কাছিম বেরিয়ে নদীতীর প্রায় ঢেকে ফেলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানসিখানা ভরে গেলো। প্রাত-রাশের মুখেই ওরা জাঙ্গাডায় এসে পৌঁছে গেলো। লুঠের মাল জাঙ্গাডার যাত্রী আর মাঝি মাল্লাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হলো।

৮ই জুলাই সকালে সকলের নজরে পড়লো সানত্রস্তোনীয় গ্রাম। ইকা বা পুটুমায়ো নদীর মুখে হারিয়ে যাওয়া দুএকটা গাছে ঢাকা ঘর বাড়ি। পুটুমায়ো আমাজনের মস্ত উপনদী। প্যাস্টো পাহাড়ের বুক থেকে নেমেছে ইকানদীর জলধারা।

খারাপ আবহাওয়া অবশেষে কাটানো সম্ভব হলো। খুব বৃষ্টি না হলেও মাঝে মাঝে দমকা ঝড় উঠছিল। ভেলার গতি অবশ্য তাতে রুদ্ধ হলো না। আমাজনের ঢেউয়ে ভেলার দৈর্ঘ্যের জন্যে এর কোন ক্ষতিও হলো না। তবে মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে গ্যারাল পরিবারের সকলকেই ঘরেই কাটাতে হলো। ফলে কথাবার্তার মধ্য দিয়েই সকলের সময়টা কেটে চললো। এই সুযোগে টরেস আরও বেশি করেই এবার কথাবার্তায় অংশ নিলো। ব্রাজিলের উত্তরে বেড়ানোর ওর অভিজ্ঞতা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। লোকটা নিঃসন্দেহে অনেক কিছুই দেখেছে। লোক্‌টার আবভাবে আরও প্রকট হলো সে মিনার দিকেই বেশি নজর দিতে চায়। ব্যাপারটা ম্যানোয়েলেরও দৃষ্টি এড়ালো না। মিনার দৃষ্টিতে লোকটার প্রতি বিতৃষ্ণা খোলাখুলিই প্রকট হচ্ছিলো।

৯ই জুন সকালে বাঁ দিকে নজরে পড়লো টুনাটিন নদীর মোহনা।

প্রায় চারশ ফিট চওড়া মোহনায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নদীটা তার কালোজলধারা নিয়ে। এখানে আমাজনের রূপ সত্যিই মহান। পাইলটকে এবার অতি সাবধানেই ভেলাখানা আঘাত আর চড়ায় ঠেকে যাওয়ার ভয় বাঁচিয়ে চালিয়ে নিতে হচ্ছে।

১৩ই জুলাই কাপুরো দ্বীপ ছুঁয়ে জাঙ্গাডা আবার এগিয়ে চললো। পার হলো জুটাহি নদীর পাঁচশো ফিট চওড়া মোহনা। নদীর পাড়ে পাড়ে অসংখ্য বাঁদরের কিচির মিচির শোনা গেলো। অঞ্চলটায় অজস্র সাদা বাঁদরের বাস।

১৮ই জুলাই ভ্রমণকারীরা ছোট্ট এন্টেবোয়া গ্রামে এসে পৌঁছলো। মাঝি মাল্লাদের বিশ্রামের জন্যে জাঙ্গাডার এখানে বারো ঘণ্টার বিশ্রাম।

আমাজনের অন্যান্য মিশন গ্রামের মতো ফন্টেবোয়াও তার খেয়ালী ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পায়নি—সেটা হলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যাওয়া। খুব সম্ভব এখন নদীটা তার যাযাবর প্রকৃতি ছেড়ে স্থির হয়েছে। জায়গাটা ভারি চমৎকার—গোটা ত্রিশ পাতায় ঢাকা কুটির আর গুয়াদালুপের নতরদামের গির্জা। এখানকার লোক সংখ্যা প্রায় এক হাজার—সবাই প্রায় ইণ্ডিয়ান। এখানে প্রচুর শুশুক জলে ভেসে বেড়ায়।

দুটো ছোট উঠাম নৌকোয় তিনজন করে জেলে রওয়ানা হয়ে পড়লো শুশুক শিকারে। প্রাণীগুলো নিমেষেই কোথায় ডুব মারলো। ওদের হাতে এক একটা সেকেলে হারপুন। একটা কাঠের টুকরোর মাথায় একটা কাঁটা। একজনের হাতে ওই হারপুন, অন্যদুজন উবাস বাইতে ব্যস্ত রইলো। একটু পরেই দুটো শুশুককে ভেসে উঠতে দেখেই দুজন হারপুন ছুঁড়তেই, একটা শুশুক পালিয়ে গেলো অন্যটার ল্যাজের কাছে কাঁটাটা বিঁধে গেলো। এবার সামান্য কসরত করে প্রাণীটাকে টেনে আনলেই হলো।

তীরে পৌঁছনোর পর দেখা গেলো শুশুকটা লম্বায় মাত্র তিনফিট।

খুব ছোটই—কারণ এরা বারো থেকে পনেরো ফিটও দীর্ঘ হয়। কিন্তু অনবরত শিকার করার ফলেই এদের সংখ্যা লুপ্ত হয়ে চলেছে। এ-গুলোর মাংস দারুণ সুস্বাদু, এমন কি শূকরের মাংসের চেয়েও মিষ্টি।

১৯শে জুলাই সূর্যাস্তের কাছাকাছি ফন্টেবোয়া ছেড়ে রওয়ানা হলো জাঙ্গাডা ক্রমে নির্জন নদীতীর কাটিয়ে এগিয়ে চললো। আকাশে কালো মেঘের আনাগোনায় বোঝা গেলো এখনও ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

এখানেই জুরুয়া নদী দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে এনে বাঁদিকে আমাজনে মিশেছে। এখান থেকে কোন জলযানে চড়ে অনায়াসেই পেরুতে পৌঁছনো যায়।

'আমার মনে হয় এখানেই ওরেলানা সেই মহিলা যোদ্ধাদের দেখা পেয়েছিলেন', ম্যানোয়েল বলে। 'তবে ওরা কোন আলাদা দল গড়ে না—ওরা ওদের স্বামীদেরই সাহায্য করতেই যোদ্ধাবেশ নেয়। জাত-টার খুব সাহসী বলে নাম আছে।'

জাঙ্গাডা আমাজন বেয়ে দক্ষিণে নেমে চলেছে। আমাজন এখানে এক বিচিত্র গোলকধাঁধাঁর রূপ নিয়েছে। এখান থেকে আমাজনের উপনদী রিও জাপুরা প্রায় সমান্তরাল হয়েই বয়ে চলেছে। চারদিকে ছড়ানো শুধু অজস্র দ্বীপ আর খাল আর হ্রদ।

আরাউজো'র কাছে কোন মানচিত্র না থাকলেও ওর অভিজ্ঞতাই ওর চাবিকাঠি। অনায়াসেই ও জাঙ্গাডা পথ দেখিয়ে নিচে চললো। ওর কৌশলী হাতের স্পর্শ মিললো জাঙ্গাডা ২৫শে জুলাই বিকেলে পারানি-টাপেরা গ্রাম কাটিয়ে এগা হ্রদের মুখে এসে থামলো। ওই হ্রদের মধ্যে জাঙ্গাডা ঢুকলো না, ঢুকলে আর বেরিয়ে এসে আমাজনে পড়া সম্ভবপর হতো না।

এগার শহরটারও কিছু নাম আছে।—জাঙ্গাডা ২৭শে জুলাই পর্যন্ত এখানে থাকবে আর আগামী কাল বড়ো নৌকোয় চেপে পরিবারের সকলে এগা শহর ভ্রমণে যাবে। ঠিক হলো।

॥ ষোল ॥ এগা

পরদিন সকাল ছ'টায় ইয়াকুইটা, মিনা, লিনা আর দুই তরুণ বন্ধু জাঙ্গাডা থেকে নামার বন্দোবস্ত করে ফেললো।

জোয়াম গ্যারাল, এতোদিন পর্যন্ত তীরে নামার কোন রকম আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু বাড়ির মেয়েদের অনুরোধে সেও নিজের কাজ রেখে তীরে নেমে একটু ঘুরে আসতে রাজি হলো। টরেস এগা শহর দেখার কোন রকম আগ্রহ দেখালো না। ব্যাপারটা ম্যানোয়েলের কাছে খুবই স্বস্তির কারণ হয়ে উঠলো। লোকটাকে কিছুতেই ও সহ্য করতে পারে না।—

এগা বেশ বড়ো শহর। এখানকার লোক সংখ্যাও প্রায় পনেরো'শ। শহরে নানা রকম মানুষ—শাসনকর্তা, সৈন্যদল, পুলিশ-কর্তা, বিচারক, শিক্ষক, সব জীবিকারই মানুষের বাস এখানে। একটা বড়ো শহরে যা দরকার সবই এখানে আছে।

এতো রকম মানুষ যেখানে তাদের স্ত্রী পরিবার নিয়ে বাস করে সেখানে ক্ষৌরকারকেও যে প্রয়োজন এতো জানা কথাই। অতএব এরকম জায়েগায় ফ্রাগোসোর খরচাই উঠবে না হয় তো। তবু ফ্রাগোসো মন মরা হয়নি।

ব্যবসা না হোক, সকলের সঙ্গে একবার শহরটা দেখে আসবে বলেই ও মনস্থ করলো। বিশেষ করে লিনা যদি সঙ্গে থাকে তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু জাঙ্গাডা ছেড়ে নেমে আসার মুখেই ও লিনার কথায় জাঙ্গ'ডা ছেড়ে নেমে আসার মুখেই ও লিনার কথায় জাঙ্গা-ডাতেই রয়ে গেলো।

'মিঃ ফ্রাগোসো', লিনা ওকে একপাশে টেনে এনে বলে।

'আপনার বন্ধু টরেস মনে হয় এগা দেখতে যাবে না।'

'খুব সম্ভব যাবে না, ও জাঙ্গাডাতেই থাকছে, মিস লিনা। তবে দয়া করে আপনি আর ওকে আমার বন্ধু বলবেন না।'

'কিন্তু আপনিই তো চাইবার আগেই ওকে জাঙ্গাডায় নিমন্ত্রণ করে বসেছিলেন।'

'হ্যাঁ, তা—তা—তখন, যদি সত্যিই শুনতে চান, আমি বড়োই বোকার মতো কাজ করে ফেলেছি মামি।'

'করেছিলেনই তো। আর আমার কি মনে হয় একবার শুনবেন? আমার লোকটাকে একদম ভালো মনে হয় না, মিঃ ফ্রাগোসো।'

'আমারও লোকটাকে ভালো মনে হয় না, মিস লিনা। আর আমার সব সময়েই কি মনে হয় জানেন, লোকটাকে, কোথায় যেন দেখেছি আমি। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়তে চাইছে না; তবে সেই স্মৃতিটা খুব সুখকর নয়!'

'কোথায় কখন ওকে দেখে থাকতে পারেন? একবার মনে পড়ছে না? মনে পড়লে বোঝা যেত লোকটাকে আর কি করতো?' লিনা বলে।

'নাঃ—চেষ্টা তো করছি। কতোদিন আগে? কোন দেশেই বা? কি ভাবে কখন কিছুই যে মনে করতে পারছি না।'

'মিঃ ফ্রাগোসো।'

'বলুন, মিস লিনা।'

'আপনি জাঙ্গাডায় থাকুন আর আমাদের অনুপস্থিতির সময় ওর ওপর নজর রাখুন!'

'এ্যাঁ? আপনার সঙ্গে এগায় যেতে পারবো না, সারাদিন আপনাকে না দেখেই থাকতে হবে?'

'আপনাকে তাই করতে বলছি। আমার অনুরোধ।'

'নিশ্চয়ই থাকবো।'

'আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'উঁহু, তাহলে আপনার হাতটা একটু ধরতে দিয়ে ধন্যবাদ দিন', ফ্রাগোসো জবাব দেয়, 'খুবই আনন্দ পাবো তাহলে।'

লিনা ওর হাতটা এগিয়ে দিতেই ফ্রাগোসো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বেশিক্ষণই যেন হাতটা ওর মুঠোয় চেপেরাখতে চাইলো। এই কারণেই ফ্রাগোসোর নৌকোয় চাপা হয়ে উঠলো না আর অজান্তেই ও টরেসের পাহারাদার হয়ে উঠলো।

যাকে নিয়ে এতো আলোচনা সে কি বুঝতে পেরেছে সকলের মানোভাব কি রকম? হয় তো বুঝেছে, তবুও নিঃসন্দেহে এমন কোন কারণ আছে যাতে এটা সে গায়ে মাখছে না।

যেখানে নঙ্গর ফেলা হয়েছে সেখান থেকে নদী তীরের দূরত্ব প্রায় চার লীগ। যাওয়া আসায় আট লীগ—নৌকোয় মোট যাত্রী ছ'জন, এছাড়া দুজন নিগ্রো মাল্লা।

নৌকোর মাস্তলে তাই চওড়া পাল তুলে দেওয়া হলো। বেনিতো হাল ধরলো। লিনা ফ্রাগোসোকে ইঙ্গিতে চোখ খোলা রাখতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই নৌকা ছেড়ে দিলো।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে নৌকোখানা এই পুরনো মিশনের বন্দরে এসে ভিড়লো। মিশনটা কিছু সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৭৫৯ সালে শহরের পত্তন হয়। তারপর থেকেই জেনারেল গামার নেতৃত্বে এ শহর ব্রাজিলের অধীন হয়েই আছে।

নৌকো তীরে এসে লাগতেই সকলে সমতল উপকূলে এসে নামলো। এখানে ওখানে ওখানে রাখা দুএকটা ছোট জলযান ওদের নজরে পড়লো।

মিনা আর লিনা এগায় এসে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলো।

'কি বিরাট শহর!' মিনা বলে ওঠে।

'বাব্বা! কি বড়ো বড়ো বাড়ি আর কতো লোকজন', লিনার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো।

ওদের ভাব দেখে বেনিতো হাসলো 'প্রায় পনোরো'শর বেশি

মানুষ আছে এদেশটায়। কম করেও ছ'শ বাড়ি। কোন কোনটা আবার দোতলা। বড়ো বড়ো সত্যিকার রাস্তাও আছে!'

'ম্যানোয়েল', মিনা বলে ওঠে, 'দাদার হাত থেকে আমাদের বাঁচাও। দেখছো না, দাদা আবার ঠাট্টা সুরু করেছে—ওতো আমাজন আর প্যারার বড়ো শহরগুলো দেখে নিয়েছে তাই—।'

'ঠিক বলেছিস, আমাকেও ঠাট্টা করতে ছাড়ছে না দেখেছিস', ইয়াকুইটাও বলে, 'আমি কিন্তু এরকম শহর কখনও দেখিনি স্বীকার করছি।'

'তাহলে, মা আর বোনটি আমার তোমরা সাবধান, দেখো মানাও'তে পোঁছে আবার যেন হারিও না আর বেলেমে পৌঁছলে তোমাদের আর যে খুঁজেই পাওয়া যাবে না।'

'মা ভৈঃ', ম্যানোয়েল হেসে ওঠে, 'ভদ্রমহিলারা উত্তর আমাজনের বড়ো বড়ো শহরের সৌন্দর্য দেখে তার আগেই নিজেদের তৈরী করে ফেলবেন নিশ্চয়ই।'

'হুঁ, ম্যানোয়েল।' মিনা গম্ভীর হয়ে বলে, 'তুমিও দাদার মতো ঠাট্টা করছো বোধ হয়?'

'কক্ষনও না, বিশ্বাস করো।'

'তা আপনারা হাসুন গিয়ে', লিনা জবাব দেয়, 'দিদি, আমরা চারদিক একবার দেখি আসুন, কি সুন্দর দৃশ্য চারদিকে।'

সত্যিই সুন্দর। মাটির তৈরী সাদা রঙ করা বাড়িগুলো ভারি চমৎকার! মাঝে মাঝে তালগাছের সারি। জানলা দরজায় সবুজ রঙের স্পর্শ। দেয়ালের কাছে কমলালেবু গাছে ধরেছে থোকা থোকা ফুল। দূরে নজরে আসছে মস্ত তেরেসার গির্জা। দুপাশে সারিবদ্ধ নারকেল আর জলপাই গাছ।

মেয়ে দুটির আশ্চর্য হবার অবশ্য অন্য আর একটা কারণও আছে।— তা হলো ব্রাজিলি মেয়েদের পোশাক। এখানকার প্রধান কর্মকর্তাদের

স্ত্রী ও মেয়েদের পোশাক সত্যিই মনোহর। যদিও এগা প্যারা থেকে পাঁচ'শ লীগ আর প্যারী থেকে অনেক হাজার মাইল দূরে।

'কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের।'

'লিনা পাগল হয়ে যাবে!' বেনিতো হেসে ওঠে।

'পোশাকগুলো ঠিক মতো পরলে ওরকম অদ্ভুত লাগতো না', মিনা বলে।

'প্রিয় মিনা', ম্যানোয়েল বলে, 'তোমার ওই সাধারণ গাউত টুপি ব্রাজিলি মেয়েদের চেয়ে ঢের ভালো—ওদের তো ওটা নিজেদের পোশাক নয়, ওটা বিদেশী।'

'তোমার যদি তাই ভাবতে ভালো লাগে, ভাবো। তবে আমি ওদের হিংসে করছি না, কিন্তু।' মিনা জবাব দেয়।

এবার রাস্তা দিয়ে ওরা এগিয়ে চললো। রাস্তার চারদিকে ছোট ছোট দোকান। ওরা বাজারের কাছাকাছি এসে পৌছলো। একটা ছোট হোটেলে ঢুকে ওরা প্রাতরাশও সেরে নিলো। তারপর সকলে আবার নৌকোয় ফিরে এলো।

সেই সকালের পথ বেয়েই নৌকো পাল তুলে তরতর করে এগিয়ে চললো জাঙ্গাডার দিকে।

লিনা ফ্রাগোসোকে কাছে পেয়েই এগিয়ে এলো এবার।

'সন্দেহজনক কিছু দেখেছেন না কি?' ও প্রশ্ন করলো।

'না, মিস লিনা,' ফ্রাগোসো জানায়, 'টরেস ওর কেবিন ছেড়ে প্রায় বাইরেই আসেনি, ঘরে বসে শুধু লেখা পড়া করেছে।

'ও বাড়ির মধ্যে বা খাবার ঘরে ঢোকেনি যেমন ভয় করেছিলাম?'

'না, যখনই ও কেবিন থেকে বাইরে এসেছে ভেলার গলুইয়ের কাছেই শুধু গেছে।'

'তখন কি করছিলো ও?'

'খুব মনোযোগ দিয়ে একখণ্ড পুরনো কাগজ হাতে করে দেখছিলো আর আপন মনে কি সব বক বক করছিলো।'

'ওটা খুব একটা বাজে ব্যাপার বলে মনে করবেন না, মিঃ ফ্রাগোসো। ওই লেখা পড়া আর পুরনো কাগজের নিশ্চয়ই কিছু মানে আছে। লোকটাতো কোন অধ্যাপক বা উকিল নয়, যতোই লেখাপড়ার ভান করুক।'

'ঠিক বলেছেন।'

'তাহলেও লক্ষ্য রাখতে ভুলবেন না, মিঃ ফ্রাগোসো।'

'ওর ওপর কড়া নজর রাখবো, মিস লিনা,' ফ্রাগোসো উত্তর দেয়।

পরদিন, ২৭শে জুলাই ভোরবেলায় বেনিতো পাইটলকে জাঙ্গাডা ছাড়তে সঙ্কেত জানালো।

নানা দ্বীপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললো ভেলা। নজরে পড়লো ছ'হাজার দ'শ ফিট চওড়া এ্যারেনাপো উপসাগরের মোহনা আর জাপুরা নদী। প্রায় আটটা মুখ দিয়ে বিশাস নদীটি আমাজনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

২৯শে জুলাই সন্ধ্যায় ক্যাচুয়া দ্বীপের কাছে জাঙ্গাডা নঙর ফেললো। এখানেই রাত কাটানো হবে। রাতও আজ ঘন অন্ধকারে ঢাকা।

সকালে দিগন্তরেখার ওপর সূর্যোদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বীপের ওপর একদল মুরা ইণ্ডিয়ানকে দেখা গেল। লোকগুলো বারবার আসা যাওয়া করে ভেলাটা লক্ষ্য করেছিল। ওদের অনেকের হাতে ব্লো-পাইপ বা বাঁকনল। গাছের আড়ালে লুকিয়ে ওরা লোকটার ওপর নজর রাখতে লাগলো।

জোয়াম গ্যারাল সকলকে সাবধান করে দিলো কোনভাবেই যেন জংলী ইণ্ডিয়ানদের প্ররোচনা না দেওয়া হয়।

প্রকৃত পক্ষে দুপক্ষের শক্তির কোন তুলনা হয় না। মুরা ইণ্ডিয়ানরা ব্লো-পাইপ ছুঁড়তে খুব ওস্তাদ। তীরগুলো প্রায় তিন'শ ফিট দূর থেকেও গভীর ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।

তীরগুলো একজাতের তালগাছের পাতায় তৈরী তুলোয় লাগানো, আর ন থেকে দশ ইঞ্চি লম্বা, মাথা সূঁচের মতো তীক্ষ্ণ আর তাতে 'কিউরারি' বিষ মাখানো।

কিউরারি একজাতের তীব্র বিষ। যার স্পর্শেই নিমেষে মৃত্যু ঘটে, রেড ইণ্ডিয়ান প্রবাদ। বিষটা তারা তৈরী করে এক বিশেষ গাছের কন্দ থেকে জারক রস নির্গত করে। এ ছাড়াও তারা এতে মিশিয়ে নেয় কিছু বিষাক্ত পিঁপড়ে আর সাপের বিষ।

'সত্যিই এ বিষ সাংঘাতিক,' ম্যানোয়েল বলে,' এটা গায়ে বেঁধার সঙ্গে সঙ্গে বোধ শক্তি লোপ পায়, হৃৎপিণ্ড সঙ্গে সঙ্গে অচল না হলেও আস্তে আস্তে শরীর সম্পূর্ণ অবশ হয়ে আক্রান্তের মৃত্যু ঘটে। তাছাড়া এ বিষের কোন রকম প্রতিষেধকও আবিষ্কার হয়নি এখনও।'

সুখের বিষয় মুরারা কোন রকম আক্রমণ করার চেষ্টা করলো না। রাত নেমে আসতেই দ্বীপের গাছগুলোর মধ্য থেকে ভেসে এলো বাঁশীর সুর।

ফ্রাগোসো হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে গান গেয়ে বাঁশির উত্তর দিতে যেতেই লিনা তৎক্ষণাৎ ওর মুখে হাত চেপে ধরতেই বেচারার সঙ্গীত প্রতিভাটুকু আর কাউকে শোনানো হলো না।

২রা আগষ্ট বিকেলে বেলা প্রায় তিনটের কাছাকাছি কুড়ি লীগ দূরের আপোয়ারা হ্রদের মুখে এসে থামলো। এখানেই রাত্রির মতো জাঙ্গাডাখানা নঙর ফেললো।

পরদিন সকালেই আবার যাত্রা সুরু। ৫ই আগষ্ট ইউকুরা নদীর খাল বেয়ে ভেলা ভেসে চললো আর ৬ই আগষ্ট এসে পৌছলো মিয়ানা হ্রদের মুখে।

লিনার অনুরোধ মতো ফ্রাগোসো সমানেই টরেসকে লক্ষ্য করে

চলেছে। বার বার ও টরেসের আগের জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে কিন্তু প্রতিবারই লোকটা ওই বিষয়ে কথা বলতে নেহাতই অনিচ্ছুক প্রমাণ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত সে ফ্রাগোসোর সঙ্গে বাক্যালাপ করাই একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে।

গ্যারাল পরিবারের সঙ্গে ওর মেলামেশা আগের মতোই আছে। সে জোয়ামের সঙ্গে, বিশেষ কথাবার্তা না কইলেও ইয়াকুইটা বা তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। অবশ্য সেখানে ওর প্রতি শীতলতাটুকুও গায়ে মখেতে চায় না। ওদের সকলেরই মত ভেলা মানাওতে পৌঁছলে টরেসকে বিদায় নিতে হবে, ওর নামও কেউ আর করবে না ভুলেও। ইয়াকুইটা এ ব্যাপারে পাদ্রী পাসানহার উপদেশই মেনে চলেছে। কিন্তু ম্যানোয়েলের উপর পাদ্রীর জোর তেমন খাটছে না। ম্যানোয়েল ভেলায় আশ্রয় দেওয়া লোকটাকে তীরে নামিয়েই দিতে ইচ্ছুক।

সেদিন সন্ধ্যাতে একটা ঘটনা ঘটে গেলো।

জোয়াম গ্যারালের অনুরোধে নদীতে ভেসে চলা একটা বড়ো নৌকা জাঙ্গাডার পাশে এসে থামলো।

প্রধান মাল্লা এক ইণ্ডিয়ানকে জোয়াম জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কি মানাও'তে চলেছেন?

'হাঁ,' লোকটা জবাব দেয়।

'কবে পৌঁছবেন ওখানে?'

'আট দিনের মাথায়।'

'তাহলে তো আমাদের আগেই পৌঁছচ্ছেন। আমার চিঠি পৌঁছে দেবেন?'

'আনন্দের সঙ্গেই দেবো।'

'তাহলে বন্ধু এই চিঠিটা নিন, মানাও'তে পৌঁছে দেবেন।'

জোয়ামের হাত থেকে ইণ্ডিয়ান লোকটি চিঠি আর বকশিস হিসেবে একমুঠো রেইস মুদ্রা পকেটস্থ করে ফেললো।

পরিবারের অন্য সকলেই ভিতরে থাকায় এ ঘটনার কথা কিছুই জানতে পারলো না। একমাত্র সাক্ষী হলো টরেস। সে জোয়াম আর ইণ্ডিয়ানের মধ্যে কিছু কথাবার্তা বিনিময় হতে দেখলো—ওর মুখে একটা কালো মেঘের পর্দা নেমে আসতেই বোঝা গেলো এ ভাবে চিঠি পাঠানোর ব্যাপার দেখে ও খুবই আশ্চর্য হয়ে পড়েছে।

॥ সতেরো ॥ আক্রমণ

ম্যানোয়েল যদিও টরেসের ব্যাপারটা নিয়ে জাঙ্গাডার উপর কোন রকম নাটকের অবতারণা করতে চায়নি তাহলেও বেনিতোর সঙ্গে এ বিষয়ে ও কিছু পর্যালোচনা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো।

'বেনিতো,' ম্যানোয়েল বেনিতেকে জাঙ্গাডার একপাশে টেনে নিলো, 'তোমাকে দু একটা কথা না বলে পারছি না।'

বেনিতো মোটামুটি একটু আমুদে প্রকৃতির হলেও ম্যানোয়েলের মুখ দেখে ওর চোখে মুখেও মেঘ ঘনিয়ে এলো।

'কেন, আমি জানি,' ও জবাব দেয়, 'টরেস সম্বন্ধে কিছু বলবে তো?'

'হ্যাঁ, বেনিতো।'

'আমিও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'মিনার দিকে ওর নজরটা তাহলে তুমি লক্ষ্য করেছো,' একটু ফ্যাকাশে দেখালো ম্যানোয়েলকে।

'আঃ! তাহলে লোকটাকে হিংসে করছো নাকি, তাই—,' বেনিতো তাড়াতাড়ি বলে।

'না,' ম্যানোয়েল বলে, 'কখনও তা নয়! যে আমার স্ত্রী হতে চলেছে তাকে কোন রকম আঘাত আমি কখনই দেবো না। না, বেনিতো। মিনা লোকটাকে দেখলেই ভয় পায়! আমি ওরকম

কোন কিছু ভাবছি না; কিন্তু আমার একটা ব্যাপার দেখে দারুণ গা জ্বালা করে যে লোকটা অনবরত তোমার মা আর বোনের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে চায়—যে পরিবারের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা তার সঙ্গে—।'

'ম্যানোয়েল,' বেনিতো গম্ভীর হয়ে উঠলো, 'ওই সন্দেহ জনক লোকটার প্রতি তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পারছি। বারবার আমিও মনে মনে কথাটা ভেবে দেখেছি। টরেসকে বহু আগেই ভেলা থেকে দূর করে দিতাম। কিন্তু সাহস পাইনি।'

'সাহস পাওনি?' বন্ধুর হাত ধরে ঝাঁকুনি লাগালো ম্যানোয়েল, 'সাহস পাওনি?'

'কথাটা শোনো, ম্যানোয়েল, 'বেনিতো বলে চললো, টরেসকে নিশ্চয়ই ভালো করে লক্ষ্য করেছো, তাই না? আমার বোনের দিকে ওর নজরের কথা বলছো। কথাটা খুবই সত্যি। কিন্তু এটা লক্ষ্য করার মধ্যে এটাও কি লক্ষ্য করে দেখোনি যে ওই বিরক্তিকর লোকটা বাবার ওপর থেকে একবারও ওর নজর সরাতে চায় না—ও বাবার কাছেই থাকুক বা দূরেই থাকুক। দেখে মনে হয় লোকটা মনে মনে কোন এক বদ মতলব নিয়েই ওভাবে একনাগাড়ে বাবাকে লক্ষ্য করতে চায়।'

'এসমস্ত কি বলছো তুমি, বেনিতো? তোমার কি ধারণা তোমার বাবার ওপর ওই শয়তান টরেসের কোন রকম রাগ আছে?'

'না। আমি কিছুই ভাবিনি,' বেনিতো জবাব দিলো, 'আমার একটা আশঙ্কা মাত্র। কিন্তু ভালো করে একবার টরেসের দিকে তাকাও, ওর মুখটা একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করে দেখো, তখনই দেখতে পাবে বাবাকে একবার দেখলেই ওর মুখখানায় এক ধরনের কুটিল হাসি ফুটে ওঠে।'

'তা যদি হয়, বেনিতো,' ম্যানোয়েল অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে,

'লোকটাকে দূর করে দেবার এর চেয়ে আর ভালো কারণ নেই।'

'কারণ থাক—আর নাই থাক,' বেনিতো বলে, 'ম্যানোয়েল, আমার ভয়ের কারণটা কি তাই ধরতে পারছি না। জানি না—কিন্তু বাবাকে বলে টরেসকে তাড়ানোর ব্যাপারটা হয়তো হঠকারিতাই হবে। তবু বলছি, আমার একটু ভয় হচ্ছে—কিন্তু—কিন্তু সেই ভয়ের কারণ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।'

কথাটা শেষ করতেই চাপা রাগে একবার চেঁচিয়ে উঠল বেনিতো।

'তাহলে আমাদের অপেক্ষা করা উচিত বলতে চাও?' ম্যানোয়েল প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ; কিছু করার আগে অপেক্ষাই করতে হবে, কিন্তু সবার উপরে আমাদের সাবধান হতে হবে।'

'তবে,' ম্যানোয়েল জবাব দিলো, 'আর দিন কুড়ির মধ্যেই আমরা মানাওতে পৌঁছবো। টরেসকে ওখানেই থামতে হবে। লোকটা ওখানেই বিদায় হবে—লোকটার হাত থেকে আমরা বরাবরের জন্য রেহাই পাবো। ততক্ষণ পর্যন্ত ওর ওপর কড়া নজর না রাখলেই নয়।'

'তাহলে আমার কথাটা বুঝতে পেরেছো, ম্যানোয়েল?' বেনিতো জানতে চাইলো।

'বুঝেছি, ভাই,' ম্যানোয়েল জবাব দেয়, 'তবে তোমার ওই ভয়ের ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে পারি না বা মানছি না। তোমার বাবা আর ভবঘুরেটার মধ্যে কি সম্পর্ক থাকা সম্ভব? পরিস্কার বুঝতে পারা যায় ওকে কোন কালেই তোমার বাবা মোটেই দেখেন নি!'

'বাবা যে ওকে চেনেন ওকথা বলছি না,' বেনিতো বলে, 'তবে আমার কেমন যেন ধারণা টরেস বাবাকে চেনে। লোকটাকে যখন

আমরা ইকুইটোর জঙ্গলে প্রথম দেখি তখন ফ্যাজেনডার আশেপাশে ও কি করছিলো? তখন ও আমাদের আমন্ত্রণ না নিয়ে কেন আবার পরে এই রকম কৌশল করে জাঙ্গাডায় এক রকম জোর করেই নিজেকে চাপিয়ে দিলো? আমরা টাবাটিঙ্গায় পৌছলাম আর সেখানে ও আমাদের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলো। মনে হচ্ছে কোন মতলব হাঁসিলের জন্যেই এই সাক্ষাৎ। যখনই আমি টরেসের চকিত আর শয়তানী দৃষ্টি ভরা চোখ লক্ষ্য করি তখনই কথাগুলো আমার মনে হয়। বুঝতে পারছি না। এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। ওঃ! কেন যে লোকটাকে ভেলায় আসার কথা বলেছিলাম!'

'শান্ত হও, বেনিতো, আমার অনুরোধ শোনো।'

'ম্যানোয়েল!' বেনিতো তবুও বলতে চায়, 'ভেবে দেখো একবার লোকটা যদি শুধু আমার মনটাই এরকম বিষিয়ে তুলতো তাহলে এই মুহূর্তেই ওকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইতঃস্তত করতাম না। কিন্তু ব্যাপারটা যখন বাবার সঙ্গে জড়িত, তখন মনে হয় আমার ধারণা মিটাতে গিয়ে হয়তো উদ্দেশ্যটাই পণ্ড করে ফেলবো! আমার মন বলছে এই মতলববাজ লোকটার হঠাৎ কিছু করতে গেলে বিপদ আছে, যতক্ষণ না লোকটাই কোন রকম সুযোগ দিচ্ছে—সুযোগ আর সঠিক কারণ। অল্প কথায় যতক্ষণ ও জাঙ্গাডার উপর আছে ও আমাদের কজায়, আমরা দুজনে যদি বাবার উপর ভালো করে নজর রাখি তাহলে ও যতোই নিশ্চিন্ত হোক শেষ পর্যন্ত ওর মুখোশ খুলে ও নিজেকে জাহির করে ফেলবেই। তবে আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

ভেলার গলুইয়ের কাছে হঠাৎ টরেস এসে পড়ায় দুবন্ধুর কথাবার্তার ছেদ পড়ে গেলো। টরেস ধূর্ত ভাবে ওদের দুজনের দিকে তাকালেও কোন কথা বললো না।

এই রকম অবস্থায় দুজন তরুণ আর ফ্রাগোসো আর লিনার

অনবরত দৃষ্টি সীমার মধ্যে থেকে টরেসের পক্ষে কোন রকম চলা-ফেরা করাই অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। অবস্থাটা ও সম্ভবত বুঝতে পেরেছে। অবশ্য সেটা পারলেও ওর হাবভাবের একটুও পরিবর্তন হলো না।

নিজেদের কথাবার্তা অনুযায়ী ম্যানোয়েল আর বেনিতো, ওর কোন রকম সন্দেহ জাগার অবকাশ না দিয়েই সারাক্ষণ ওর ওপর নজর রাখতে প্রতিজ্ঞা করলো।

পরের দিনগুলোয় জাঙ্গাডা ডান পাশে কামারা, আরু আর য়ুরি পারি নদীর মোহনা পার হয়ে গেলো। ১০ই আগষ্ট সন্ধ্যায় ওরা কোকোস দ্বীপে এসে পৌঁছলো। এখানে ওরা একটা 'সেরিঙ্গাল' পার হলো। এ নামটা কুচুক সুরা তৈরীর আবাদকে বলা হয়। এই কুচুক সেরিনগুইরা গাছের রস থেকে বের করে নেওয়া হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম হলো 'সিফোনিয়া এলাস্টিকা।' অনেকের ধারণা অযত্ন আর অবহেলায় আমাজন অববাহিকায় গাছ-গুলো ক্রমশয় কমে আসছে।

প্রায় জন কুড়ি ইণ্ডিয়ান এই কুচুক সুরা তৈরীর কাজে ব্যস্ত। এ কাজটা সাধারণতঃ মে, জুন আর জুলাই মাসেই করা হয়। গাছ-গুলো সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েছে বলে প্রমাণ হওয়ার পর ইণ্ডিয়ানরা কাজ সুরু করে।

সুযোগ বুঝে বেনিতোও ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে ওদের জমানো সমস্ত কুচুকই সওদা করে ফেললো।

চারদিন পর ১৪ই আগষ্ট জাঙ্গাডা পুরুস নদীর মোহনা পার হয়ে গেলো। এখানে আরাউজো খুব কৌশলেই জাঙ্গাডা এগিয়ে নিয়ে চললো। মাঝে মাঝে এখানেও চোখে পড়ল কিছু ছোট ছোট দ্বীপ। নদীর প্রশস্ততাও এখানে দু লীগের মতো। ১৮ই আগষ্ট ভেলা পাস-কুয়োরো গ্রামে এসে রাত কাটানোর জন্যে নঙর ফেললো।

সূর্য ইতিমধ্যেই দিগন্তের বুকে ঢলে পড়েছে আর এ অঞ্চলের নিয়ম

অক্ষাংশের জন্যে তাড়াতাড়ি ভাবেই একটা বিরাট উল্কাপিণ্ডের মতোই অস্ত যেতে চলেছে।

জোয়াম গ্যারাল, তার স্ত্রী, লিনা আর বুড়ী সিবিল বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলো।

টরেস এক মুহূর্ত জোয়াম গ্যারালের দিকে কথা বলবে বলে ফিরেই সম্ভবতঃ পাদ্রী পাসানহার আচমকা পরিবারের সকলকে শুভরাত্রি জানাবার জন্যে এসে পড়ায় বাধা পেয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে গেলো।

ইণ্ডিয়ান আর নিগ্রোরা নিজের নিজের ঘরেই রয়ে গেছে। আরাউজো ও ভেলার সামনে বসে ওর সামনে বিস্তৃত জলরাশি লক্ষ্য করে চলেছিলো।

ম্যানোয়েল আর বেনিতো চোখ খুলে রেখে ধূমপান করতে করতে নানা কথা আলোচনা করতে করতে ভেলার মাঝবরাবরের পায়চারি করছিলো। শুতে যাবার আর বেশি দেরী নেই।

হঠাৎ ম্যানোয়েল বেনিতোর হাত ধরে থামলো—

'একটা অদ্ভুত গন্ধ আসছে! ঠিক না? তুমি পাচ্ছোনা?'

'মনে হয় যেন পোড়া কস্তুরীর 'গন্ধ।' বেনিতো জবাব দিলো, 'কাছাকাছি তীরের ওপর কোথাও কুমীর টুমীর ঘুমিয়ে আছে মনে হয়।'

'হুঁ' প্রকৃতি এইভাবেই বোধ হয় ওদের ধরিয়ে দিতে চায়।'

'হ্যাঁ,' বেনিতো বলে, 'সেটা একদিক দিয়ে মঙ্গলই বলতে হবে, জন্তুগুলো ভারি সাংঘাতিক।'

দিনের শেষে এই সরীসৃপগুলো প্রায়ই তীরে এসে আরামে রাত কাটাতে চায়। কোন গর্তের কাছে ওরা হাঁ করে ঘুমিয়ে থাকে, যাতে শিকার ধরা সম্ভব হয়। শিকারের পেছনে তা সে জলে সাঁতার কেটেই হোক বা তীরের ওপরে তাড়া করেই হোক ছোটো সরীসৃপ গুলোর একরকম খেলার সামিল। তীরের ওপর ওদের সঙ্গে পাল্লা দেয় কোন মানুষেরও সাধ্য নেই।

এই বিশাল বেলাভূমিতেই জন্মে বাস করে—এরা অদ্ভুত রকম দীর্ঘজীবি। শতায়ু কুমীরগুলোকে ওদের গায়ের ওপর সঞ্চিত শ্যাওলা দেখে আর হিংস্রতা দেখেই বোঝা যায়। যতো বয়স হয়, এগুলো ততোই হিংস্র হয়ে ওঠে।

আচমকা জাঙ্গাডায় সামনের অংশ থেকে চিৎকার ভেসে এলো।

'কুমীর! কুমীর!'

ম্যানোয়েল আর বেনিতো এগুতেই তিনটে বিরাট আকারের প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি ফিট লম্বা কুমীরকে ভেলার পাটাতনের উপর দেখতে পেলো।

'বন্দুক। বন্দুক আনো,' ইণ্ডিয়ান আর নিগ্রোদের পেছনে সরে যেতে ইঙ্গিত করে বেনিতো চিৎকার করে উঠলো।

'সবাই ঘরের মধ্যে পালাও,' ম্যানোয়েল চিৎকার করে উঠলো, 'শিগ্গীর।'

কাজটা করতে দেরী হলো না। গ্যারাল পরিবারের সকলেই বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই দুই বন্ধুও এসে দাঁড়ালো। ইণ্ডিয়ান আর কালোমানুষরাও যে যার কুটিরে ঢুকে পড়লো। ওরা দরজাগুলো বন্ধ করতে যেতেই ম্যানোয়েল চেঁচিয়ে উঠলো, 'মিনা কোথায়?

'দিদি তো এখানে নেই,' মিনার ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে লিনা।

'হা ভগবান! মিনা কোথায় গেলো?' ওর মা চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে।

'মিনা! মিনা!'

কোন সাড়া নেই।

'ওই তো মিনা জাঙ্গাডার সামনের দিকে।' বেনিতো হাত দেখালো।

দুই বন্ধু, ফ্রাগোসো আর জোয়াম গ্যারাল বিপদের কথা ভুলেই বন্দুক হাতে বাড়ির বাইরে এসে ছুটতে লাগলো।

ওরা বাইরে আসতে না আসতেই ছুটো কুমীর এক পাক ঘুরেই ওদের তাড়া করলো।

ছুচোখের মাঝখানে, কপালে বেনিতোর ছোঁড়া গুলিটা ঢুকতেই একটা শয়তান সাংঘাতিক আহত হয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে পাশে কাত হয়ে পড়লো।

দ্বিতীয়টা তখনও বেঁচে ছুটে আসছে, পাশ কাটানোর কোন পথই নাই।

ল্যাজের প্রচণ্ড এক ঝাপটায় জোয়াম গ্যারালকে ছিটকে ফেলে দৈত্যাকৃতি প্রাণীটা হাঁ করেই তাকে গিলতে এলো।

ঠিক তখনই কেবিন থেকে একটা কুড়ুল হাতে টরেস বাইরে ছুটে এসে প্রাণীটার চোয়ালের নিচে প্রচণ্ড আঘাত করে বসতেই কুমীরটা আহত হয়ে নেতিয়ে পড়লো।

রক্তের স্রোতে দৈতাকৃতি প্রাণীটা এবার ক্রুদ্ধ হয়ে একপাশে ঘুরে একেবারে জলে ঠিকরে পড়ে তলিয়ে গেলো।

'মিনা! মিনা।' পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগলো ম্যানোয়েল।

আচমকা দৃষ্টি পথে ভেসে ওঠে মিনা। সে আরাউজোর কেবিন আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে চলেছে। কেবিন এই মাত্রই তৃতীয় কুমীরটার ল্যাজের প্রচণ্ড ঝাপটায় এলোমেলো হয়ে পড়েছে। মিনা ভীতা হরিণীর মতোই কুমীরটার তাড়া খেয়ে ঘরের মধ্যে ছুটে চলেছে, দৈত্যটা বোধ হয় ওর চেয়ে ছ'ফিট দূরেও নেই।

হঠাৎ এবার আছাড় খেয়ে উঠলো পড়লো মিনা।

বেনিতোর দ্বিতীয় গুলিটা কুমীরটার গতি রুদ্ধ করতে পারলো না। জন্তুটার শিরদাঁড়ায় লেগে কিছু মাংসই খুলে উঠে গেলো, গুলি ভেতরে বিঁধলো না।

ম্যানোয়েল ঝাঁপিয়ে পড়ে মিনাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে

ছিনিয়ে নিতে যেতেই জন্তুটার শক্তিশালী ল্যাজের প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়লো এক পাশে।

মিনা সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারালো। প্রকাণ্ড মুখব্যাদান করে হিংস্র প্রাণীটা ওকে গিলতে এগিয়ে গেলো।

একটা কল্পনাতীত শিহরণের মূহুর্ত। ফ্রাগোসো একটা উন্মুক্ত ছুরি হাতে নিয়ে জন্তুটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটার গলার নিচে বসিয়ে দিলো।

মূহুর্তের মধ্যেই ফ্রাগোসোর হাত দুটো দানবটার মুখের মধ্যেই চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যেতো। যদি ওটা মুখটা বন্ধ করে ফেলতো।

ফ্রাগোসো সময় মতো হাত বের করে নিলেও কুমীরটার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সহ্য করতে না পেরে নদীর জলে ছিটকে পড়লো। নদীর আশে পাশের সারা জলটাই লাল হয়ে উঠলো।

'ফ্রাগোসো। ফ্রাগোসো।' ভেলার ধারে হাঁটু গেড়ে বসে কাতর আর্তনাদ করে উঠলো কেবল লিনা।

কয়েকটা শ্বাসরোধী মূহুর্ত। তারপরেই আমাজনের বুকের উপর ভেসে উঠলো ফ্রাগোসোর মূর্তি।—সম্পূর্ণ অক্ষত অনাহত।

কিন্তু নিজের জীবন বিপন্ন করেই ও মিনার জীবন রক্ষা করেছে—কিছুক্ষণ পরেই ওর জ্ঞান ফিরে এলো। একটু পরেই ম্যানোয়েল, ইয়াকুইটা, মিনা আর লিনার আগ্রহী হাত এগিয়ে যেতেই ফ্রাগোসো বোধ হয় একটু হকচকিয়ে গেলো। কি বলবে বুঝতে না পেরেই বোধ হয় ও তরুণী দো আঁশালা লিনার হাত চেপে ধরলো।

যাই হোক, যদিও ফ্রাগোসোই মিনার জীবন বাঁচিয়েছে তবুও এটাও নিঃসন্দেহে ঠিক যে টরেসের সময় মত হস্তক্ষেপের ফলেই জোয়াম গ্যারাল তার প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

পরিষ্কার হয়ে গেলো ক্যাজেন্ডার মালিকের জীবনের উপর ভবঘুরে লোকটার কোন লোভ নেই। বাস্তব পরিস্থিতিই এটা মানতে বাধ্য করছে।

ম্যানোয়েল কথাগুলো নিচুস্বরে বেনিতোকে জানালো।

'কথাটা বিশ্বাস না করে উপায় কি, ব্যাপারটা তো সত্যিই,' বেনিতো দিশাহারা হয়ে পড়ে, 'তোমার কথাই ঠিক, ওর মতলব বোঝা কঠিন। তা যাই হোক, ম্যানোয়েল, আমার সন্দেহ কিন্তু যেতে চাইছে না। মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রুও কিন্তু সবসময় তার মৃত্যু আশা করে না।'

জোয়াম গ্যারাল এবার টরেসের কাছে এগিয়ে গেল।

'ধন্যবাদ, টরেস।' টরেসের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল জোয়াম গ্যারাল।

ও শুধু দু এক পা পিছিয়ে গেলো। কোনো জবাব দিলো না।

'টরেস।' জোয়াম বলে চললো, 'আমার দুঃখ, আমরা ভ্রমণের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছি—আর কয়েকটা দিন পরেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে। আমি তোমার কাছে খুবই ঋণী—।'

'জোয়াম গ্যারাল,' টরেস জবাব দিলো, 'আপনার আমার কাছে কোন ঋণ নেই। আপনার জীবন আমার কাছে অন্য যে কোন কিছুর চেয়েই মূল্যবান। তবে আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে—তাহলে ভাবছিলাম যে মানাওতে না থেমে একবার বেলেমেই যাবো। আমাকে সঙ্গে নিতে রাজী আছেন?'

জোয়াম গ্যারাল মাথা নেড়ে সায় দিলো।

লোকটার দাবী শুনে একটা অসতর্ক মুহূর্তেই বেনিতো হস্তক্ষেপ করতে চাইতেই ম্যানোয়েল ওকে বাধা দিলো। বেনিতো প্রচণ্ড চেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত আত্মসম্বরণ করলো।

।। আঠারো ।। নৈশভোজ

প্রচণ্ড উত্তেজনার সেই রাত কাটার পর সকালের আলো ছড়িয়ে পড়তেই কুমীর-উপকূল থেকে নঙর তুলে আবার যাত্রা সুরু হলো। কোন রকম বাধা বিপত্তি না ঘটলে আর দিন পাঁচেকের মধ্যেই জাঙ্গাডার মানাও বন্দরে পৌঁছবার কথা।

ইতিমধ্যে মিনা প্রচণ্ড সেই ভীতি কাটিয়ে উঠেছে, ওর চোখের দৃষ্টি আর হাসিতেই ও ওর জন্যে যারা জীবন বিপন্ন করেছিলো তাদের কৃতজ্ঞতা জানালো।

লিনার ব্যাপারটা অবশ্য একটু আলাদা। ও ফ্রাগোসের জন্যেই যেন গর্বিত—ও নিজের জীবন বাঁচালেও বোধ হয় এতটা খুশি হতো না।

'শিগ্‌গীরই আপনার পাওনা মিটিয়ে দেবো, মিঃ ফ্রাগোসো,' লিনা হাসতে হাসতে বলে।

'কি ভাবে মেটাবেন, মিস লিনা?'

'ওঃ! তাতো ভালো করেই জানেন!'

'তাহলে দেরী না করে তাড়াতাড়ি করুন,' আমুদে ফ্রাগোসো জবাব দিতে দেরী করলো না।

ওই সময় থেকেই কানাঘুষো শোনা যেতে লাগলো যে সুন্দরী লিনার সঙ্গে ফ্রাগোসোর বাগদান হয়ে গেছে আর মিনা আর ম্যানোয়েলের বিয়ের সময় ওদের দুজনেরও বিয়ে হবে। নবদম্পতি অন্যান্য সকলের সঙ্গে বেলেমেই থাকবে।

কথাটা জানাজানি হতে সবচেয়ে খুশি হলো সম্ভবতঃ ফ্রাগোসো। ওতো মনের খুশি আর চেপে রাখতে পারল না।

খুশির আতিশয্যে ও বলেই ফেলে, 'প্যারা যে অত দূরে তা আমার জানা ছিলো না।

ম্যানোয়েল আর বেনিতোর ব্যাপার অন্য রকম। যে ধরনের ব্যাপার ঘটে গেলো তারপর ওদের দুজনের মধ্যে খুব গভীর একটা আলোচনা হলো। জোয়াম গ্যারালের কাছ থেকে তার জীবন-দাতাকে যে সরানো যাবে না তাতে সন্দেহ নেই।

'আপনার জীবন আমার কাছে অন্য যে কোন কিছুর চেয়েই মূল্যবান,' টরেসের বলা কথাটা বেনিতোর মনে পড়লো।

সে সময় কথাটা অতিশয়োক্তি আর হেঁয়ালির মতো হলেও বেনিতো কথাটা মনে রেখেছে।

ইতিমধ্যে তরুণ বন্ধু দুজনের করার কিছুই নেই। শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা এই। কিন্তু সে অপেক্ষা শুধু চার পাঁচদিনের তো নয়—প্রায় সাত আট সপ্তাহের ক্লান্তিকর অপেক্ষা।

'সব কিছুর মধ্যেই কেমন যেন রহস্যের আমেজ, আমি ব্যাপারটা যেন বুঝে উঠতে পারছি না,' বেনিতো বলতে চায়।

'হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত,' ম্যানোয়েল জবাব দিলো,' এটা নিশ্চিত যে টরেস তোমার বাবার প্রাণ চায় না। আর এর পরের ঘটনার জন্যে আমাদের এখনও নজর রেখে চলতে হবে।'

এটুকু পরিষ্কার হয়ে গেলো যে টরেস ঐদিন থেকে নিজেকে আরও বেশি করেই গুটিয়ে নিয়েছে। পরিবারের কারো সঙ্গে ও মেশামেশা করতে চাইছে না আর মিনার দিকেও তেমন নজর দিচ্ছে না। এতে সবাই কিছুটা স্বস্তি পায় একমাত্র জোয়াম গ্যারাল ছাড়া। একমাত্র সেই ঘটনাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলো।

ওই দিন সন্ধ্যায় ওরা বারোসো দ্বীপ পার হয়ে গেলো। এখানে ক্যালডেরন, হুয়ারানডিনা আর আরও অনেক কালো জলের হ্রদ

আছে। এই জল দেখেই বোঝা যায় আমাজনের সব চেয়ে বিচিত্র উপনদী রিও নিগ্রো'র এগিয়ে আসার কথা।

বাঁ দিকের অপরূপ শোভা ভাসমান এই অরণ্যের চেয়ে সত্যিই চমৎকার। সত্যিই যেন প্রাকৃতিক একটা মানচিত্রই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সবুজ তরাঙ্গায়িত এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাস্তব আর কল্পনা যেন এখানে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। যেন দুটো বিভিন্ন জগতের মধ্যে দিয়ে ভেলা গোলাকার পথ পার হয়ে চলেছে।

সব কিছুতেই আরাউজোর পাকা হাতের স্পর্শ। সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য মাঝি মাল্লাদের সাহায্য। দুপাশের উপকূলের গাছের গুঁড়ি গুলোয় ঠেকা দিয়ে জাঙ্গাডা এগিয়ে নেওয়া হতে থাকলো।

'সত্যিই কেমন চমৎকার দৃশ্য,' মিনা বলে ওঠে, 'এমন ভাবে ছায়ায় ঘেরা পথ বেয়ে বেড়াতে কি আনন্দ।'

'যেমন আরামের তেমনি আবার বিপদও আছে,' ম্যানোয়েল বলে উঠলো, 'একটা নৌকো হলে তেমন কিছু ভাবনার ছিলোনা চালিয়ে নিতে—কিন্তু কাঠের এই প্রকাণ্ড ভেলা চালাতে বাধাহীন জলস্রোতই ভালো।'

'আর কয়েক ঘণ্টা পরেই এই জঙ্গল কাটিয়ে যেতে পারবো আমরা,' পাইলট জানালো।

'তাহলে ভালো করে দেখে নিন,' লিনা বলে ওঠে, 'সুন্দর দৃশ্য গুলো কি রকম তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছে, দেখুন। দিদি, দেখেছো একপাল বাঁদর আর পাখি গাছের আড়ালে কেমন কিচির মিচির করছে।'

'আর আধফোটা ফুলগুলো কেমন বাতাসে দুলতে চাইছে,' মিনার খুশি বুঝি বাঁধ মানে না।

'আর চমৎকার ওই আঙুরলতাগুলো কেমন গাছে গাছে ছড়িয়ে আছে।' লিনা বলে উঠলো।

'তবে ওই লতার শেষ প্রান্তে কোন ফ্রাগোসো নেই, এই যা!'

লিনার বাগদত্তের মন্তব্য, ইকুইটোর জঙ্গলে সেদিন একটা ভারি চমৎকার ফুলই তুলেছিলে তুমি।'

'আরে, আরে এই ফুলটা দেখো—ছনিয়ায় বোধ ; হয় আর ছটো নেই এ রকম ফুল,' লিনা রহস্যচ্ছলে বলে ওঠে, 'আর গাছ গুলোও একবার দেখ।'

জলের উপর ভাসমান কিছু জলজ লতার বুকে ফুটে উঠেছে রঙীন ফুল। তার কোনটা আকারে মস্তো বড়োই। এক একটার কুঁড়ি আকারে ছোট নারকেলেরই মতো। শুধু ফুলই নয় প্রকৃতি এখানে ছ হাত উজাড় করেই তার সৌন্দর্য্য ঢেলে দিতে চেয়েছে মনে হয়। কতো রঙ-বেরঙের হাজার হাজার পাখির কলরবে ভরে উঠেছে চার দিকের শান্ত পরিবেশ।

এ ছাড়াও প্রকৃতির আর কিছু বিচিত্র অদ্ভুত সৃষ্টিও সকলের নজর এড়ালো না। এ হলো জলের বুকে ভেসে চলা নানা ধরনের দারুণ বিষধর সাপ। এক জাতের সরীসৃপের নাম 'জিমনোটাস'। এর স্পর্শে মানুষ বা জীব যতো শক্তিশালীই হোক না কেন মুহূর্তে বিদ্যুতের স্পর্শে অবশ হয়ে এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

তিনটে দিন কেটে গেলো। মানাও'র কাছে পৌঁছে যেতে চলেছে জাঙ্গাডা আর তার যাত্রীরা। আর মাত্র চব্বিশটি ঘণ্টা—তারপরেই ভেলাখানা রিও নেগ্রো নদীর মোহনা ছাড়িয়ে আমাজনের বিশাল প্রদেশটির রাজধানীর কাছেই এসে পৌঁছবে।

২৩শে আগষ্ট বিকেল পাঁচটায় প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি জাঙ্গাডা নদীর দক্ষিণ তীরে মুরাস দ্বীপে এসে দাঁড়ালো। এবার শুধু আড়াআড়ি ভাবে কয়েক মাইল পার হয়ে বন্দরে পৌঁছনো—কিন্তু পাইলট আরা-উজো সঙ্গত কারণেই রাত নেমে আসার জন্যে সে পথ নিতে চাইলো না কিছুতেই। ওই বাকি তিন মাইল পথ পাড়ি দিতে আরও তিন ঘণ্টা লাগবে—সবচেয়ে বেশি এখন দরকার অতি স্বচ্ছ দৃষ্টি আর অভিজ্ঞতা।

আজকের নৈশাহারের মধ্যে কিছু বৈচিত্র্যই দেখা গেলো। আমাজন পাড়ি দেবার অর্ধেকটাই কেটেছে—আর সব কিছুই তো ভালোয় ভালোয় মিটেছে বলেই। আজকের এ সান্ধ্য অনুষ্ঠানে তাই বুঝি আমাজনের স্বাস্থ্য-পান করার উদ্দেশ্যেই আনা হলো ওপোর্তো আর সেতুবালের বন্দর থেকে আনা সেই অতিখ্যাত সুরা—যার খ্যাতি ভুবনময়। অন্য একটা উদ্দেশ্যও এর সঙ্গে জড়িত। তা হলো ফ্রাগোসো আর সুন্দরী লিনার বাগদানের অনুষ্ঠান—ম্যানোয়েল আর মিনার বাগদান এর কয়েক সপ্তাহ আগেই ইকুইটোতে ফ্যাজেনডায় সম্পন্ন হয়ে গেছে।

অতএব লিনা আর ফ্রাগোসো তাদের জন্যে রাখা আসনে এসে বসলো। লিনা বিয়ের পরেও মিনার সঙ্গেই থাকবে আর ফ্রাগোসো কাজ নেবে ম্যানোয়েল ভ্যালডেজের কাছে। আজকের এ অনুষ্ঠানে দুজনের আসন তাই খুবই সম্মানের।

স্বভাবতই টরেসও আজকের এ অনুষ্ঠানে একজন আমন্ত্রিত অতিথি। জাঙ্গাডার বুকে এ ধরণের ভোজও বড়ো একটা হয়নি।

টরেস, জোয়াম গ্যারালের সামনে এসে বসে পড়লো। টরেসের চোখের সেই অদ্ভুত দৃষ্টি ওর নজর এড়ালো না। ওই অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে সে জোয়াম গ্যারালকেই কেবল লক্ষ্য করছে। ওর ওই দৃষ্টি যেন কিছুটা বন্য জন্তুর মতো—জন্তুটা যেন শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তাকে সম্মোহিত করে ফেলতে চায়।

ম্যানোয়েল সারাক্ষণ মিনার সঙ্গে কথা বলেই কাটালো। তবে মাঝে মাঝে ওর নজর ঘুরে পড়লো টরেসের ওপর। কিন্তু বেনিতোর চেয়ে অনেক বেশি কৌশলেই ম্যানোয়েল ওর দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করে চললো।

ভোজ সভার কাজ চমৎকার ভাবেই শেষ হলো। লিনা তার চমৎকার স্বভাবগুণে সকলকে হাসিখুশি রাখতেই চাইলো। সঙ্গে রইলো ফ্রাগোসোর দুএকটা সময়পোযোগী উত্তর।

পাদ্রী পাসানহাও দারুণ খুশি। চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে খুশি মনেই খেয়ে চলেছেন পাদ্রী মশাই। হবু দুটি তরুণ দম্পতির উপর তার আশীর্বাদ বর্ষিত হতে তো আর তেমন দেরী নেই। প্যারার পবিত্র বারি তাঁর হাত দিয়েই বর্ষিত হবে।

'ভালো করে খেয়ে নিন, ফাদার, বেনিতো বলে ওঠে, 'ওদের একবার দেখুন, ওদের আশীর্বাদ করবেন তো? একটু গায়ে জোর করে নিন এবার।'

'তা বাছা', পাদ্রী পাসানহা সস্মিত হাসিতে বললেন, 'একটা লালটুকটুকে লক্ষ্মী মেয়ে পেলে তোমাকেও ওদের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারার শক্তি কিন্তু এখনও আমার আছে।'

'ঠিক বলেছেন পাদ্রী মশাই', ম্যানোয়েল হেসে ওঠে, 'তাহলে, আসুন বেনিতোর বিয়ের সম্মানেই আমরা পান করি।'

'তাহলে এবার বেলেমে একটা লক্ষ্মী মেয়ে খুঁজে বের করতে হয়', মিনা বলে, সকলেই যা করে ওই বা তা করবে না কেন?'

'তাহলে মিঃ বেনিতোর ভাবী বিয়ের জন্যেই আসুন পান করা যাক', ফ্রাগোসো উঠে দাঁড়ায়, 'এখনই ওঁর বিয়ে করা উচিত।'

'ঠিকই বলছো সবাই', ইয়াকুইটা এবার বলে ওঠে, 'আমারও ইচ্ছে বেনিতোর বিয়ে হোক এখনই—আর ও মিনা আর ম্যানোয়েল আর তোমাদের বাবার মতোই সুখী হোক।'

'আমার আশা, আপনি চিরকাল সুখেই থাকুন', একগ্লাস পোর্টস্থুরা হাতে নিয়ে কেউ কিছু বলার আগেই টরেস বলে উঠলো, 'এখানকার সকলেরই সুখ যার যার নিজেরই হাতে।'

আচমকা ভবঘুরে টরেসের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কথাটায় যেন একটা অপ্রীতির ভাবই জেগে উঠলো।

ম্যানোয়েল ব্যাপারটা বুঝেই আবহাওয়াটুকু বদল করার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, দেখুন, পাদ্রী মশাই, এই বিয়ের ব্যাপারটা বলছিলাম, ভেলায় বিয়ে দেবার মতো আর কাউকে পাওয়া যাবে না?'

'তা—তাতো আমার জানা নেই।', পাদ্রী প্যাসানহা উত্তর দেন, 'এক যদি টরেস থাকে—তোমার বিয়ে হয়নি বোধ হয়, টরেস?'

'না; আমি চিরকালই অবিবাহিত থাকছি, আমার বিয়ের কোন আশা নেই।'

বেনিতো আর ম্যানোয়েলের মনে হলো কথাটা বলার সময় টরেস একবার মিনার মুখের দিকে তাকালো।

'বিয়ে করছো না কেন, বাধা কিসের?' পাদ্রী পাসানহা আবার প্রশ্ন করলেন, 'বেলেমে গিয়ে তোমার পছন্দমত একটা মেয়ে খুঁজে বিয়ে করে ফেলো। তারপর দরকার হলে বা তেমন সুযোগ মিলে গেলে সেখানেই থেকে যেতে পারবে। এই রকম ভাবে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে তাইই বরং ভালো হবে।'

'আপনার কথা ঠিকই, পাদ্রীমশাই', টরেস জবাব দিলো, 'আমি অস্বীকার করতে পারছি না। তাছাড়া ব্যাপারটা একটু ছোঁয়াচেও বলতে পারেন। এই নবু তরুণ দম্পত্তিদের দেখে আমারও যে একটু বিয়ের ইচ্ছে মনে জাগছে না তাই বা বলি কি করে। তবে দেখুন, বেলেমে আমি একেবারেই অজ্ঞাত কুলশীল—আর তাছাড়া সেখানে পাকাপাকি ভাবে আমার বাস করার ব্যাপারেও কিছু বাধা আছে।'

'আপনি তাহলে কোথা থেকে আসছেন?' ফ্রাগোসো প্রশ্ন করে উঠলো। ওর সব সময়েই একটা কেমন ধারণা মনের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে চলেছিলো যে টরেসকে ও কোথাও না কোথাও দেখেছে।

'আমি আসছি মিনাস গেরায়েস' প্রদেশ থেকে।

'তাহলে আপনি জন্মেছিলেন—।'

'হীরে-জেলার রাজধানী টিজুকো'তে।'

এসময় যারা জোয়াম গ্যারালের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছে তারা এটা দেখে দারুণ আশ্চর্যই হয়ে পড়তো যে জোয়াম গ্যারালের দৃষ্টি তির্যক হয়েই টরেসের চোখের উপর পড়েছে।

॥ উনিশ ॥ প্রাচীন ইতিহাস

এবার শুধু ফ্রাগোসোই কথাবার্তা চালিয়ে নিতে চাইলো। আগের কথার জের টেনেই ও বলে, 'কি! আপনি টিজুকো থেকে আসছেন? টিজুকো, মানে সেই হীরে-জেলার রাজধানী?'

'হ্যাঁ', টরেস জবাব দিলো, 'তুমিও ওই প্রদেশের লোক না কি?'

'না! আমি ব্রাজিলের উত্তরে আটলান্টিকের পারের মানুষ', ফ্রাগোসো জানালো।

'হীরে-জেলার কথা আপনি বোধ হয় জানেন না, মিঃ ম্যানোয়েল?' টরেস এবার ম্যানোয়েলকে প্রশ্ন করলো।

ম্যানোয়েল কোন জবাব না দিয়ে মাথা ঝাঁকালো।

'আর আপনি, মিঃ বেনিতো'? টরেস যেন তরুণ গ্যারালকে কথা-বার্তায় নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যেই প্রশ্নটা করতে চাইলো, 'আপনার কোনকালে হীরে পৌঁছেনোর কাজ দেখতে আগ্রহ জাগেনি?

'না', গম্ভীর-হয়ে জবাব দিলো বেনিতো।

'আঃ!' দেশটা আমার দারুণ দেখতে ইচ্ছে করছে', ফ্রাগোসো উৎফুল্ল স্বরে বললো, অবচেতন মনে ও টরেসেরই ইচ্ছাটাকেই ইন্ধন জুগিয়ে বললো, 'ইচ্ছে হচ্ছে আমি খুব দামী এক মুঠো হীরে তুলে নিয়ে চলে আসি।'

'অতো দামী এক মুঠো হীরে তোমার কি কাজে লাগবে, ফ্রাগোসো?' লিনা জানতে চায়।

'কি কাজে লাগবে? বিক্রী করে ফেলবো।'

'তাহলে তো তুমি বিরাট ধনী মানুষ হয়ে পড়বে!'

'খুব বড়োলোক হয়ে যাবো।'

'হুঁ, তাহলে তিন মাস আগে বড়োলোক হলে তুমি তো আর ওই আঙুর-লতার ব্যাপারটা ভাবতে না?'

'ঠিক। তা যদি না ভাবতাম তাহলে এমন চমৎকার বউই বা কোথায় পেতাম', ফ্রাগোসো বলে, 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।'

'তাহলে দেখছো, ফ্রাগোসো', এবার মিনা বলে, 'তুমি যেই লিনাকে বিয়ে করতে চলেছো অমনি হীরের দাম কেমন বদলে গেলো। তোমার আসলে কোন ক্ষতিই হলো না।'

'ঠিক কথা বলেছেন, মিস মিনা', চনমন করে ওঠে ফ্রাগোসো, 'আমার লাভই হয়েছে মনে হচ্ছে।'

সন্দেহের অবকাশ রইলো না যে টরেস কথাবার্তায় ছেদ টানতে অনিচ্ছুক। সে এর জের টেনেই কথা চালাতে চাইলো আবার।

'একটা ব্যাপার ঠিক, যে টিজুকো'তে আচমকা ভাগ্য ফিরিয়ে নেওয়া সহজ কাজ। এখানে তাই যে কোন মানুষের মাথা ঠিক রাখা শক্ত। আপনারা কখনও এ্যাবেটের বিখ্যাত হীরে গল্প শুনেছেন? ওই হীরের দাম কত জানেন? বিশলক্ষ রেইস! ওই হীরে ব্রাজিলের খনি থেকে আনা হয়েছিলো—ওজন এক আউন্স। আর হলো কি জানেন? তিন জন আসামীই—তিন তিনজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী এ্যাবেট নদীতে টেরো দ্য ফ্রিও থেকে নব্বই লীগ দূরে আচমকা হীরেটা দেখতে পাওয়া যায়।'

'তাতেই তাদের ভাগ্য ফিরে গেলো? ফ্রাগোসো জানতে চাইলো।

'না,' টরেস জবাব দেয়, 'হীরেটা খনিগুলোর গর্ভনর-জেনারেলের কাছে জমা দেওয়া হয়। হীরেটার দাম যাচাই করা হলো—আর পর্তুগালের রাজা ষষ্ঠজন ওটাকে কাটিয়ে উৎসব ইত্যাদিতে মাথার মুকুটে লাগাতেন। আর ওই আসামীরা অবশ্য মার্জনা পেয়ে গেলো

—ওই টুকুই কেবল। খুব চালাক লোকেরাও এর চেয়ে বেশি সুবিধা বা অর্থ বোধ হয় সব সময় পায় না।'

'আপনার সন্দেহ আছে?' বেনিতো শুষ্ক স্বরে বলে ওঠে।

'তা—তা একটু আছে বৈকি। থাকবে নাই বা কেন?' টরেস জবাব দেয়। 'আপনি কোন হীরে জেলায় গিয়েছেন নাকি?' ও এবার জোয়াম গ্যারলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

'না, কখনও যাই নি।' টরেসের চোখে চোখ রেখে জবাব দিলো জোয়াম গ্যারাল।

'ভারি আপশোষের কথা।' টরেস জবাব দেয়,' একদিন ঘুরে আসবেন। জায়গাটা সত্যিই খুব অদ্ভুত। সারা ব্রাজিল সাম্রাজ্যের মধ্যে হীরে জেলা জায়গাটা খুবই নির্জন জায়গায়—কিছুটা ডজন খানেক লীগের একটা বাগানের মতো জায়গা নিয়ে ঘেরা—আশে পাশের প্রদেশগুলো থেকে এটা একেবারেই আলাদা রকমের। কিন্তু আগেই বলেছি আপনাদের, এটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী জায়গা, কারণ ১৮০৭ সাল থেকে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত ক'বছরে এখানকার উৎপাদন ছিলো আঠারো হাজার ক্যারাট। আহা! কতো নতুন বিচিত্র কিছুই যে ওখানে পাওয়া গেছে, শুধু যারা পাহাড়ের একেবারে চুড়োয় উঠেছে তারাই নয়, যে সব চোরা চালানদার জুয়াচুরির মধ্য দিয়ে এগুলো রপ্তানি করে তাদের কাছেও। কিন্তু তা বলে খনির মধ্যের কাজ খুব সুখকর নয় মোটেও আর সরকারের নিয়োগ করা যে দুহাজার কালাআদমী ওখানে কাজ করে তারাও মাঝে মাঝে হীরে মেশানো বালি নেবার জন্যে জলের গতিপথও বদলে দিতে চায়? আগে কাজটা খুবই সহজ ছিলো।'

'আসল কথা হলো, সে সুদিন আর নেই।' ফ্রাগোসো বলে উঠলো।

'তবে এখনও যে সহজ রাস্তায় হীরেগুলো হাতিয়ে নেওয়া যায় তাহলে নীতির বালাই ত্যাগ কায়দার মধ্য দিয়ে—অর্থাৎ, চুরি

করে; তারপর শুনুন—১৮২৬ সালে আমি যখন আটবছরের তখন টিজুকোতে এক সাংঘাতিক নাটক অভিনীত হয়। এতেই বোঝা যায় ভাগ্য ফেরাবার জন্যে আঘাত করতে পারার সুযোগ মিললে অপরাধীরা কোন রকম কাজেই নিজেদের গুটিয়ে রাখে না। তা, কাহিনীটা আপনাদের বোধ হয় কেমন ভালো লাগছে না।

'ঠিক উল্টোটাই, টরেস, বলে যাও,' শান্ত স্বরে বলে জোয়াম গ্যারাল।

'তবে তাই হোক,' টরেস জবাব দিলো, 'কাহিনীটা হলো হীরে চুরির—সামান্য একমুঠো ওই হীরের দাম কয়েক লক্ষ টাকা, কখনও কখনও তারও বেশি!'

কাহিনীটা শোনাতে শোনাতে টরেসের মুখে বিচিত্র লোভের একটা ছায়া খেলে গেলো।

'তারপরে যা হলো শুনুন,' ও বলে চলে আবার, 'টিজুকোয় নিয়ম ছিলো সারা বছরের সংগ্রহ করা হীরে একবারেই পাঠানো। আকার অনুযায়ী হীরেগুলো দুটো ভাগে ভাগ করা হতো—বিভিন্ন আকৃতির ঝাঁঝরির গর্তের মধ্যে দিয়ে ওগুলো বাছাই করার পর। তারপর থলেয় ভরে রিও ডি জেনিরোতে পাঠানো হতো; কিন্তু ওগুলোর দাম বহু লক্ষ টাকা হওয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর পাহারায় ওগুলো পাঠানো হতো। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বাছাই করা একজন কর্মচারী জেলার সৈন্যবাহিনীর চারজন অশ্বারোহী আর দশজন পায়ে হাঁটা মানুষ, ব্যাস্, এই-ই ছিলো, সম্পূর্ণ দলের চেহারা। ওরা প্রথমেই রওয়ানা হতো ভিলা রিকাতে, ওখানে দলনেতা থলেগুলোর উপর সীলমোহর করে নেবার পর দলটি রওয়ানা হতো রিও ডি জেনিরোর পথে। সাবধানতার জন্যে এই যাত্রার সুরুর কথা গোপনই রাখা হতো। যাই হোক, ১৮২৬ সালে ডাকস্টা নামে এক তরুণ, বয়স হবে বাইশ বা তেইশ, লোকটা কয়েক বছর ধরে গর্ভনর জেনারেলের অফিসে কাজ করছিলো—একটা মতলব ভাঁজলো। লোকটা একদল

চোরা চালানকারীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দলটার রওয়ানা হবার তারিখটা জানিয়ে দিলো। শয়তানগুলোও সেই মতো ব্যবস্থা করে রাখলো। ওদের দলটায় লোকজনও অনেক আর সকলেই সশস্ত্র। ভিলা রিকার কাছাকাছি, ২২শে জানুয়ারী রাত্রিতে ওই ডাকাতের দল হীরে বহন-কারী দলটাকে আচমকা আক্রমণ করে বসলো—সৈন্যরা প্রানপণে সাহসের সঙ্গেই বাধা দিলো—কিন্তু প্রত্যেককেই হত্যা করা হলো। শুধু একজনকে ছাড়া—লোকটা সাংঘাতিক আহত হয়েও কোনরকমে পালিয়ে গিয়ে মারাত্মক ঘটনার কথা জানালো। সেই কর্মচারী লোকটাও সৈন্যদের মতোই রেহাই পেলোনা। ডাকাতগুলোর আক্রমণে লোকটা পড়ে গেলে তাকে টানতে টানতে ওরা কোন পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যায়। লোকটার দেহ আর পাওয়া যায় নি।'

'আর ওই ডাকস্টা ?' জোয়াম গ্যারাল প্রশ্ন করলো।'

'হুঁ, লোকটার অপরাধ ওকে ক্ষমা করেনি। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই সন্দেহটা ওর উপরেই পড়তে চাইলো। ঘটনা ওরই সাজানো বলেই ওকে অভিযুক্ত করা হলো। বৃথাই ও নিজেকে নিরপরাধ বলার চেষ্টা করলো। ওর পক্ষেই যাত্রা সুরুর তারিখটা জানা সম্ভব ছিলো। একমাত্র ওর পক্ষেই চোরাচালানদারের এটা জানানো সম্ভবপর। লোকটাকে অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করা হলো—তারপর বিচার করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো। এ ধরনের শাস্তি কার্যকর করা হয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই।'

'লোকটার ফাঁসি হয়েছিলো ?' ফ্রাগোসো জানতে চাইলো।

'না,' টরেস জবাব দেয়, 'ওরা তাকে ভিলা রিকায় একটা কারাগারে বন্দী করে রাখলো—তারপর ওই রাতেই ফাঁসির কয়েক ঘণ্টা আগে' একাই হোক বা অন্য কারো সাহায্যেই হোক সে পালাতে সক্ষম হলো।'

'লোকটার কথা তারপর আর শোনা যায় নি ?' জোয়াম গ্যারাল জানতে চাইলো।

'আর শোনা যায়নি" টরেস বললো, 'সম্ভবতঃ লোকটা ব্রাজিল ছেড়েই পালায় আর এখন হয়তো সে দূরে কোথাও ডাকাতির ফসল নিয়ে মহানন্দেই জীবন কাটিয়ে চলেছে।'

'লোকটা দুঃখে কষ্টে মারাও তো যেতে পারে!' জোয়াম গ্যারাল বলে।

'কে জানে, হয়তো লোকটা ঈশ্বরের ইচ্ছায় কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনাতেই দগ্ধ হচ্ছে,' এবার পাদ্রী পাসানহা বললেন।

এবার ভোজসভার ভোজনপর্বের কাজ শেষ হতেই সকলেই বাইরের সান্ধ্য হাওয়ায় এসে বসলো। সূর্য দিগন্তরেখায় ঢলে পড়েছে—রাতের আঁধার নেমে আসতে তখনও ঘণ্টাখানেক বাকি।

'নাঃ, গল্পটা একটুও জমলো না, বাজে গল্প,' ফ্রাগোসো বলে ওঠে।

'দোষ তো তোমারই, ফ্রাগোসো,' লিনা অনুযোগ করলো। 'তুমিই তো ওই জেলা নিয়ে কথা সুরু করলে তারপর এলো হীরে—তোমার ও কথাগুলো বলা ঠিক হয় নি।'

'তা—তো কথাটা ঠিক,' ফ্রাগোসো বলে, 'তবে ওভাবে যে গল্পটা মোড় নেবে একবারও ভাবিনি।'

পরিবারের সকলেই এবার হাঁটতে হাঁটতে জাঙ্গাডার সামনের অংশে চলে এলো। ম্যানোয়েল আর বেনিতো মুখ বুঁজে হেঁটে চললো। ইয়াকুইটা আর তার মেয়েও চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেকের মনেই একটা অকারণ বিষাদের ব্যঞ্জনা যেন হঠাৎ ঘনিয়ে আসা একটা অশুভ কিছুরই পূর্বাভাষ।

টরেস পায়ে পায়ে জোয়াম গ্যারালের কাছে এগিয়ে গেলো। জোয়াম গ্যারাল চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে। টরেস আস্তে আস্তে ওর একটা কাঁধের উপর হাত রাখে,' জোয়াম গ্যারাল, আপনার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা কইতে পারি?'

জোয়াম টরেসের দিকে ঘুরে তাকালো।

'এখানেই ?'

'না, একটু আড়ালে।'

'তাহলে, এসো।'

ওরা দুজন বাড়ির দিকে গিয়ে ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। জোয়াম গ্যারাল আর টরেস আড়ালে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মনে যে প্রতিক্রিয়া হলো তা ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। ওই ভবঘুরে লোকটা আর ইকুইটোর ফ্যাজেন্ডার এই অতি সৎ মালিকের মধ্যে কি এমন দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া নেমে আসতে চাইছে—পরস্পরের সঙ্গে কথা বলারও সাহস যেন সবাই হারিয়ে ফেলেছে।

'ম্যানোয়েল!' বন্ধুর হাত ধরে বলে ওঠে বেনিতো, যাই ঘটুক, লোকটাকে কালই আমাদের ছেড়ে মানাওতে চলে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ! এটা করতেই হবে,' ম্যানোয়েল দৃঢ়স্বরে বলে।

'হ্যাঁ, আর ওর জন্যে বাবার যদি কোন রকম ফ্যাসাদ হয়—তাহলে ওকে আমি খুন করে ফেলবো!'

কুড়ি ॥ দুজনে আলোচনা

ঘরের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আর শ্রবণ সীমার বাইরে এসে জোয়াম গ্যারাল আর টরেস কোন কথা না বলে নীরবে পরস্পরের দিকে তাকালো। ভবঘুরে লোকটা কি কথা সুরু করতে ইতস্ততঃ করতে চাইছে? ওর কি সন্দেহ জোয়াম গ্যারাল ওর দাবী শুধু নীরব ভর্ৎসনাই জানাতে চাইবে?

'জোয়াম,' ও বলে উঠলো' আপনার নাম গ্যারাল নয়। আপনার আসল নাম ডাকস্টা।'

অপরাধী নামটা টরেস উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই জোয়াম গ্যারেলের সারা শরীর বেয়ে একটা ঠাণ্ডা শিহরণেই যেন বয়ে গেলো।

'আপনি জোয়াম ডাকস্টা,' টরেস বলে চললো, 'যে পঁচিশ বছর আগে টিজুকোতে গর্ভনর জেনারেল অফিসে এক কেরানী ছিলো— আর আপনিই সেই লোক যাকে ওই ডাকাতি আর খুনের মামলায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো।'

জোয়াম গ্যারালের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেলো না, ওর প্রশান্তির ভাব টরেসকে বিস্মিত করে তুললো। একটু পরে ও আবার বলে 'জোয়াম ডাকস্টা, আমি আবার বলছি আপনিই সেই লোক যাকে সকলে ওই হীরের ব্যাপারে খুঁজছিলো, যাকে ওই অপরাধী মন্তব্য করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়—আপনিই সেই লোক যে ভিলা রিকার কারাগার থেকে ফাঁসির কয়েকঘণ্টা আগে পালায়। কি হলো, জবাব দিচ্ছেন না কেন?

টরেসের এই সোজাসুজি প্রশ্নের পর দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো সরটায়। জোয়াম গ্যারাল তখনও শান্ত সমাহিত। একটা ছোট টেবিলে কনুইটা ভর দিয়ে জোয়াম গ্যারাল সোজা একদৃষ্টে টরেসের দিকে তাকালো।

'কি জবাব দেবেন?' আবার বলে টরেস।

'আমার কাছ থেকে কি রকম জবাব চাও?' শান্ত স্বরেই বলে জোয়াম।

'এমন জবাব চাই, যাতে,' আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে চলে টরেস, 'মানাওর পুলিশ প্রধানকে ডেকে আমাকে বলতে না হয়, 'এই দেখুন, এমন একজন লোক যার সনাক্ত করা একটুও কঠিন হবে না —পঁচিশ বছর অনুপস্থিতির পরেও যাকে চিনে নেওয়া যাবে আর এই লোকটাই টিজুকোর হীরে ডাকাতির প্রধান ষড়যন্ত্রকারী। এই লোকটাই দলের রক্ষাকারী সেনাদলের হত্যাকারীদের সহযোগী। আর

ফাঁসি কাঠকে কলা দেখিয়ে এই লোকটাই পালিয়েছিলো—এ হলো জোয়াম গ্যারাল, যার আসল নাম হলো জোয়াম ডাকস্টা।'

'হুঁ' তাহলে টরেস' জোয়াম গ্যারাল মুখ তোলে, 'তোমার প্রার্থনা মতো জবাব দিতে পারলেই আমার ভয়ের কিছু কারণ নেই, এই তো ?'

'না, কিছুই থাকবে না। কারণ আপনার বা আমার দুজনেরই আর এ ব্যাপারটা নিয়ে কথা কইবার কিছু থাকবে না।'

'তোমার বা আমার কারো কিছু থাকবে না ?' জোয়াম গ্যারাল প্রশ্ন করে, 'তাহলে টাকার বদলে তোমার মুখ বন্ধ করতে হবে না মনে হয়, তাই না ?'

'না। যতোটাকাই দিন ততো সুবিধা হবে না।'

'তাহলে কি চাইছো তুমি ?'

'জোয়াম গ্যারাল,' টরেস জবাব দেয়, 'আমার প্রস্তাব হলো এই। সোজাসুজি অস্বীকার করে আমার কথার তাড়াতাড়ি জবাব দেবেন না। মনে রাখবেন আপনি আমার মুঠোয়।'

'তোমার প্রস্তাব কি ? জোয়াম জানতে চায়।

একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে টরেস।

এই দোষী লোকটার হাবভাব, যার জীবন ও মুঠোয় পুরেছে, সত্যিই অবাক করে দেবার মতোই। ও আশা করেছিলো খুব কথার কাটাকাটি, অনুরোধ উপরোধ আর কান্নাকাটি। কিন্তু একটুও বিচলিত হতে চাইছে না লোকটা।

শেষ অবধি হাতদুটো তাড়াতাড়ি করে রেখে ও বলে, 'আপনার একটি মেয়ে আছে। আমার তাকে দারুণ পছন্দ—আমি—আমি তাকে বিয়ে করতে চাই!'

আপাতদৃষ্টিতে জোয়াম গ্যারাল এ ধরনের মানুষের কাছ থেকে যে কোন কিছুই আশা করছিলো তাও তার প্রশান্তি একটুও ম্লান হলো না।

'ও, তাহলে, আমাদের মহান টরেস একজন খুনী-ডাকাতের পরিবারের আত্মীয় হতে চাইছে?' জোয়াম আস্তে আস্তে বলে।

'আমার কিসে ভালো হবে না হবে সেটা আমিই বুঝবো,' টরেস জবাব দেয়, 'আমি জোয়াম গ্যারালের জামাই হতে চাই, আর তা আমি হবোই।'

'আমার মেয়ে যে ম্যানোয়েল ভ্যালডেজকে বিয়ে করতে চলেছে সেটা তাহলে অস্বীকার করছো।'

'ম্যানোয়েল ভ্যালডেজের সঙ্গে এ বিয়ে আপনিই ভেঙ্গে দেবেন।'

'আমার মেয়ে যদি তা না মানতে চায়?'

'আপনি তাকে সব ব্যাপারটা খুলে বললেই সে রাজি হবে,' টরেসের মুখ থেকে নির্লজ্জ উত্তর এলো।

'সব ব্যাপারটাই বলবো?'

'প্রয়োজন হলে সব। নিজের মন আর তার পরিবারের সুনামের সঙ্গে তার বাবার জীবনের কথাটা একবার ভাবলেই সে গররাজি হবে না।'

'তুমি একটা পুরোপুরি ইতর বদমাশ, টরেস,' আগেকার মতোই অবিচলিত শান্ত কণ্ঠে বলে জোয়াম গ্যারাল।

'বদমাশ আর খুনেরা পরস্পরের জন্যেই তো জন্মায়।'

কথাটা শুনেই জোয়াম গ্যারাল উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে টরেসের কাছে এগিয়ে এসে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর চোখে চোখ রাখে, 'টরেস, তুমি যদি জোয়াম ডাকস্টার পরিবারের একজন হতে চাও, তাহলে তোমার মনে রাখা উচিত যে অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করা হয় সে অপরাধ জোয়াম ডাকস্টা দোষী নয়, সে নিরপরাধ।'

'তাই নাকি।'

'আর আমি বলতে চাইছি,' জোয়াম জবাব দেয়, 'যে তার নির্দোষিতার প্রমাণ তোমার কাছেই আছে আর তার মেয়েকে বিয়ে করার সময় সেটা দেখাবে।'

'খুব সোজা ব্যাপার, জোয়াম গ্যারাল,' গলা নামিয়ে বলতে চায় টরেস, 'আমার কথাটা একবার শুনলেই তা অস্বীকার করার সাহস আপনার আর হবে না।'

'শুনছি, টরেস।'

'বেশ,' ভবঘুরে টরেস যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাগুলো বলতে চাইলো, 'আমি জানি আপনি নির্দোষ! আমি জানি, কারণ আসল অপরাধীকে আমি চিনি আর আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করার ক্ষমতা আমার আছে।'

'আর যে অপরাধী সেই হতভাগ্য লোকটা?'

'সে মৃত।'

'মৃত!' বিস্ময় ভরেই বলে ওঠে জোয়াম গ্যারাল; কথাটা শুনেই একটু যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো ও। নিজেকে সামলে নেবার ক্ষমতাটুকু ও যেন হারিয়ে ফেললো।

'মৃত,' টরেস আবার বলে, 'কিন্তু এই লোকটা, যাকে তার অপরাধের বহু পর থেকেই আমি চিনি, যদিও সে যে একজন অভিযুক্ত তা জানতাম না। লোকটা তার নিজের হাতে খুঁটিনাটি শুদ্ধ হীরে ডাকাতির ব্যাপারটা লিখে ফেলে। মৃত্যুর আর দেরী নেই বুঝেই সে অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে। সে জানতো জোয়াম ডাকস্টা কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলো আর কি ছদ্মনামে সেই নির্দোষ লোকটা আবার নতুন জীবন সুরু করেছে। ও জানতো ডাকস্টা ধনী, সুখী এক পরিবারের সঙ্গেই সে বাস করছে, তাহলেও ওর ধারণা ওর মনে সুখ ছিলো না। তাই অপরাধী লোকটা তাকে তার প্রাপ্য সুখটুকু ফিরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু মরণ এসে গেলো—সে তাই তার সঙ্গী, এই আমাকেই তার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার ভার দিয়ে যায়। সে ডাকস্টার নির্দোষিতার প্রমাণ তাকে পাঠিয়ে দেবার কাজ আমাকেই দিয়ে মারা যায়।'

'লোকটার নাম?' আত্মসংবরণে অসমর্থ হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে জোয়াম গ্যারাল।

'আপনার পরিবারের একজন হবার পরেই সেটা জানবেন।'

'আর লেখাটা?'

জোয়াম গ্যারাল বোধ হয় টরেসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর দেহ খুঁজে নিজের সেই নির্দোষিতার প্রমাণ ছিনিয়ে নিতে উদগ্রীব হয়ে উঠলো।

'লেখাটা নিরাপদ জায়গাতেই রাখা আছে,' টরেস জবাব দিলো, 'আপনার মেয়ে আমার স্ত্রী হবার আগে সেটা আপনি পাবেন না। এখন বলুন' এখনও অস্বীকার করবেন কি না।'

'হ্যাঁ,' জোয়াম উত্তর দেয়, 'আর ওই কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে আমার সব সম্পত্তির অর্ধেক তোমার।'

'আপনার সম্পত্তির অর্ধেক!' উৎফুল্ল হয়ে ওঠে টরেস,' বেশ, তবে এই শর্তে যে মিনাই তার বিয়েতে সেটা আমার জন্য নিয়ে আসবে।'

'এই ভাবে তুমি মৃত্যুপথযাত্রী একটা মানুষের শেষ ইচ্ছা পালন করতে চাইছো, অপরাধীর অনুশোচনার উপযুক্ত কাজই বটে।

'হ্যাঁ। এই ব্যবস্থাই।'

'আর একবার বলছি, টরেস', জোয়াম গ্যারাল বলে ওঠে, 'তুমি এক ইতর বদমাশ।'

'তা, যা বলেন।

'আর আমি অপরাধী না হওয়ায়, আমাদের দুজনের মধ্যে কোন আঁতাত সম্ভব নয়।'

'তাহলে অস্বীকার করছেন?'

'হ্যাঁ, অস্বীকার করছি।'

'এতে আপনার সর্বনাশ হবে, জোয়াম গ্যারাল। অপরাধটা আপনাকেই আঙুল তুলে দেখাবে। আপনি প্রাণদণ্ডের আসামী, আর ওই ধরনের শাস্তি মুকুবের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়নি। ধরা

পড়লে, আপনি গ্রেপ্তার হবেন, গ্রেপ্তার হলেই ফাঁসি। আমিই আপনাকে ধরিয়ে দেবো।'

অসীম ধৈর্য্য থাকলেও জোয়াম আর সহ্য করতে পারে না। ও প্রায় টরেসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়।

শয়তানের কথাতেই ওর রাগ দূর হলো।

'সাবধান', টরেস বলে ওঠে, 'আপনার স্ত্রী এখনও জানেন না তিনি জোয়াম ডাকস্টার স্ত্রী, আপনার ছেলে মেয়েরাও জানে না তারা জোয়াম ডাকস্টার সন্তান, আপনি তাদের জানাতে চাইছেন?'

আচমকা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো জোয়াম। মুহূর্তের মধ্যেই সে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়—আবার তার প্রশান্তি ফিরে আসে।

'এ আলোচনা অনেকক্ষণ ধরে চালিয়েছি, আর নয়', জোয়াম শান্ত কণ্ঠে বলে, 'আমার কর্তব্য আমি জানি।'

'সাবধান, জোয়াম গ্যারাল', শেষবারের মত বলার চেষ্টা করে টরেস। ওর হীন প্যাঁচে প্রচেষ্টা যে এভাবে নষ্ট হবে ও ভাবতেই পারলো না।

জোয়াম এবার কোন জবাব দিলো না। বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে সে টরেসকে ইঙ্গিতে ওকে অনুসরণ করতে বলে জাঙ্গাডার মাঝ বরাবর যেখানে পরিবারের সকলেই অপেক্ষারত সেদিকেই এগিয়ে চলে।

বেনিতো, ম্যানোয়েল আর অন্যান্য সবাই গভীর উদ্বেগের সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালো। ওদের চোখে পড়ে টরেসের হাবভাব তখনও কেমন হিংস্র আর চোখ দুটোয় তখনও ক্রোধের ছায়া খেলা করে চলেছে।

দুজনের মধ্যে বৈচিত্র্য খুবই প্রকট। জোয়াম গ্যারাল আত্মবিশ্বাসেই যেন ভরপুর—মুখে মৃদু হাসি।

দুজনেই ইয়াকুইটা আর অন্য সকলের সামনে এসে দাঁড়ালো কিন্তু তারা কথা সুরু করতে সাহস করলো না।

টরেসই ওর ভারি গলায় নির্লজ্জের মতো নীরবতা ভঙ্গ করতে চাইলো।

'শেষ বারের মতো, জোয়াম গ্যারাল, আপনার শেষ জবাব চাইছি।'

'তাহলে এই আমার উত্তর—।'

স্ত্রীর দিকে তাকালো জোয়াম গ্যারাল।

'ইয়াকুইটা, একটা অদ্ভুত অবস্থায় পড়েই মিনা আর ম্যানোয়েলের বিয়ের আগের ব্যবস্থাটা আমাকে পাল্টাতে হচ্ছে।'

'হুঁ, শেষ পর্যন্ত তাহলে হলো', টরেস বলে ওঠে।

জোয়াম গ্যারাল কোন উত্তর না দিয়ে একটা নিদারুণ ঘৃণার দৃষ্টিতেই ওর দিকে তাকালো।

কিন্তু কথাটা শুনে ম্যানোয়েলের হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠলো। মিনাও উঠে দাঁড়িয়ে মা'র কাছে এগিয়ে যেতে চাইলো। ইয়াকুইটা দুহাতে তাকে কাছে টেনে নিলো।

'বাবা!' বেনিতো জোয়াম গ্যারাল আর টরেসের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো, 'কি বলতে চাইছিলেন আপনি?'

'আমি বলতে চাইছিলাম', বেশ জোর দিয়েই জোয়াম গ্যারাল বলতে থাকে, 'প্যারায় পৌঁছে মিনা আর ম্যানোয়েলের বিয়ের ব্যবস্থা করতে বহু দিন দেরী হয়ে যাবে! বিয়েটা এখানেই হবে, আর হবে কালই এই জাঙ্গডার উপরে। পাদ্রী পাসানহা'ই এই বিয়ে দেবেন—অবশ্য ম্যানোয়েলের সঙ্গে আমি যে কথা এখনই বলবো তা শোনার পরে সে যদি আর দেরী করতে না চায় তবেই।'

'আঃ! বাবা! বাবা!' তরুণ ম্যানোয়েল বলে ওঠে।

'আমাকে বাবা বলে ডাকার আগে একটু অপেক্ষা করো, ম্যানোয়েল!' অসহ্য যন্ত্রণাতেই যেন কথাটা উচ্চারণ করতে চায় জোয়াম গ্যারাল।

টরেসের হাবভাবে আচমকা সমস্ত পরিবারের প্রতি যেন একটা অমার্জনীয় অসম্মান ঝরে পড়লো।

'তাহলে এই আপনার শেষ কথা?' জোয়াম গ্যারালের দিকে হাত হাত তুলে বলে টরেস।

'না, এটা আমার শেষ কথা নয়।'

'তাহলে, সেটা কি ?'

'সেটা হলো এই টরেস! এখানে প্রভু আমিই! ইচ্ছে করলে তুমি এখনই দূর হতে পারো, আর ইচ্ছে না হলেও এই মুহূর্তেই তোমাকে জাঙ্গাডা ছেড়ে চলে যেতে হবে!'

'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে, এখনই! বেনিতো বলে ওঠে, 'না হলে এখান থেকে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

টরেস কথাটা শুনেই কাঁধ ঝাঁকালো।

'ভয় দেখাবেন না। ওতে কোন লাভ হবে না! আমারও নেমে গেলে ভালো হয়, দেরী করতে চাই না। তবে আমাকে মনে রাখতেই হবে, জোয়াম গ্যারাল। আমাদের দেখা হতে খুব দেরী হবে না।'

'ব্যাপারটা বোধ হয় আমার উপরেই নির্ভর করছে', জোয়াম গ্যারাল জবাব দিলো, 'শিগগীরই আমাদের দেখা হবে—হয়তো খুব শিগগীরই, যেটা তুমি ভাবতেও পারবে না। কালকেই আমার দেখা হবে জজ রিবিরো'র সঙ্গে, এ প্রদেশের প্রধান অধিকর্তা তিনিই—তাকে আমার মানাও'তে পৌঁছবার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছি। যদি সাহস থাকে, সেখানে দেখা করতে পারো আমার সঙ্গে।'

'জজ রিবিরো'র বাড়িতে ?' কিছুটা যেন হকচকিয়ে গেলো টরেস।

'হ্যাঁ। জজ রিবিরো'র বাড়িতে', জোয়াম গ্যারাল আবার বলে।

তারপর টরেসকে বড়ো নৌকোটা দেখিয়ে প্রচণ্ড ঘৃণার সঙ্গে জোয়াম গ্যারাল চারজন লোককে ওকে এই মুহূর্তে কাছাকাছি কোন দ্বীপে নামিয়ে দিতে হুকুম দিলো।

ইতর বদমাশটা শেষ অবধি বিদায় নিলো।

আতঙ্কিত পরিবারের সকলে তখনও মালিকের নীরবতার রেশ ভাঙতে সাহস করলো না। কিন্তু হাসিখুশি ফ্রাগোসো অবস্থার গুরুত্বটুকু না বুঝেই ওর স্বভাব অনুযায়ী জোয়াম গ্যারালের কাছে এগিয়ে এলো।

'কাল যদি মিস মিনা আর মিঃ ম্যানোয়েলের বিয়েটা জাঙ্গাডার উপরেই হয়—।'

'তোমার বিয়েটাও তখনই হবে', স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জবাব দেয় জোয়াম গ্যারাল!

তারপর ম্যানোয়েলকে ইঙ্গিত করে ঘরে ঢুকে গেলো জোয়াম।

জোয়াম গ্যারাল আর ম্যানোয়েলের নিভৃত কথাবার্তাটুকু প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চললো—পরিবারের সকলের কাছে সময়টা শতাব্দীর মতো দীর্ঘ বলেই মনে হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত খুলে গেলো দরজা।

ম্যানোয়েল একাকীই বাইরে এলো। ওর মুখভাবে এক আনন্দেরই প্রতিচ্ছবি।

ইয়াকুইটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ও বলে, 'মা!' তারপর মিনাকে স্ত্রী, আর বেনিতোকে ভাই বলে সম্বোধন করে। তারপর লিনা আর ফ্রাগোসোর দিকে তাকিয়ে বলে. 'কালকেই!'

ম্যানোয়েল জোয়াম গ্যারাল আর টরেসের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তার সবটুকুই জানে। ও জানে জজ রিবিরো'র নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে গেছে জোয়াম গ্যারাল, গত একবছরের অক্লান্ত পত্রবিনিময়ের মধ্য দিয়ে। একথা সে কাউকেই জানতে দেয়নি। এইভাবেই জোয়াম গ্যারাল তাকে নিজের নির্দোষিতা বিশ্বাস করাতে পেরেছে। ও জানে, জোয়াম গ্যারাল খুব সাহসের সঙ্গেই তার বিরুদ্ধে আনা ওই ঘৃণ্য অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই এই এমন করতে রাজি হয়েছিলো। যাতে মেয়ে আর জামাইয়ের জীবনে ওই সাংঘাতিক পরিস্থিতির কোন ছাপ না পরে—তাদের যেন এর বিস্ময় স্মৃতি বহন করতে না হয়। যে নিজে এতো-দিন করে চলেছে।

হ্যাঁ, ম্যানোয়েল এর সবটাই জেনে গেছে—আর ও এটুকুও জেনেছে যে জোয়াম গ্যারাল—অর্থাৎ জোয়াম ডাকস্টা—সম্পূর্ণ নির্দোষ—আর তার এই দুর্ভাগ্যই তার দাম আরও বাড়িয়ে তাকে এতো বড়ো আর প্রিয় করে তুলেছে। ওর যা জানা ছিলো না তা হলো ফ্যাজেনডার মালিকের নির্দোষিতার বাস্তব প্রমাণ একটা আছে আর তা ওই টরেসের হাতে। জোয়াম গ্যারাল চেয়েছে ওই বিচারকের জন্যেই তা তুলে

রাখতে, যা, যদি ওই ভবঘুরে লোকটা সত্যি বলে থাকে, তাহলে এতেই তার নির্দোষিতা প্রমাণ হবে।

মানোয়েল তাই সকলকে শুধু এই জানিয়ে দিলো যে সে পাদ্রী পাসানহার কাছে ছুটো বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলতে যাচ্ছে।

পরদিন, ২৪শে আগষ্ট অনুষ্ঠান আরম্ভের প্রায় এক ঘণ্টা আগে একটা বিরাট নৌকো নদীর বাঁ তীর থেকে এগিয়ে এসে জাঙ্গাডা থামাতে হুকুম করলো। ওতে পুলিশের বড়ো কর্তা ছাড়াও কয়েকজন ছিলো। পুলিশের বড়ো কর্তা নিজের পরিচয় দিয়ে জাঙ্গাডার উপর উঠে এলেন।

ঠিক তখনই জোয়াম গ্যারাল আর পরিবারের সকলে উৎসব সাজে বাড়ির মধ্য থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

'জোয়াম গ্যারাল কোথায়?' পুলিশের বড়ো কর্তা প্রশ্ন করলেন।

'এই তো আমি,' জোয়াম জবাব দেয়।

'জোয়াম গ্যারাল,' পুলিশের কর্তা বলে চলেন, 'আপনার নামই জোয়াম ডাকস্টা; ছুটো নামই একজনের—আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।'

কথাটা শুনেই হতবুদ্ধি হয়ে ইয়াকুইটা আর মিনা দাঁড়িয়ে পড়ে। নড়াচড়ার ক্ষমতাও বুঝি ওদের হারিয়ে গেছে।

'আমার বাবা একজন খুনী?' চীৎকার করে জোয়াম গ্যারালের কাছে ছুটে এলো বেনিতো।

জোয়াম গ্যারাল ইঙ্গিত করতেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বেনিতো।

'আপনাকে শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই,' পুলিশের কর্তাকে দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করে জোয়াম গ্যারাল, 'আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা কি মানাও'র বিচারক—জজ রিবিরো সই করেছেন?'

'না,' পুলিশের কর্তা জবাব দিলেন, 'সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করার জন্যে এটাকে আমাকে দিয়েছেন, যিনি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। জজ রিবিরো গতকাল সন্ধ্যায় সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে রাত ছুটোর সময় মারা গেছেন, আর তার জ্ঞান ফেরেনি।'

'মারা গেছেন!' কথাটা শুনেই বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো জোয়াম গ্যারাল, 'মারা গেছেন! মারা গেছেন!'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের দিকে মুখ তুলে তাকালো জোয়াম গ্যারাল, 'জজ রিবিরোই একমাত্র আমার নির্দোষিতার বিষয় জানতেন। জজের এই মৃত্যু আমার পক্ষে মারাত্মক হলেও আমার হতাশ হয়ে পড়ার কোন কারণ নেই।'

এবার ম্যানোয়েলের দিকে ফিরে তাকালো জোয়াম গ্যারাল, 'ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন, দেখা যাক ভগবানের হাত থেকে মর্তের বুকে সত্য প্রচার হয় কি না!

পুলিশের কর্তা ব্যক্তিটি এবার তার সঙ্গের লোকজনকে ইঙ্গিত করতেই তারা জোয়াম গ্যারালকে গ্রেপ্তার করতে এগিয়ে গেলো।

'কিন্তু বাবা একবার বলো,' পাগলের মতোই হতাশায় চিৎকার করে উঠলো বেনিতো, 'একটা কথা বলে যাও, তাহলে দরকার হলে গায়ের জোরেও তোমার উপর এই মারাত্মক ভুলের আমরা মোকাবিলা করবো।'

'এতে কোনই ভুল নেই, বাছা,' জোয়াম গ্যারাল জবাব দিলো, 'জোয়াম ডাকস্টা আর জোয়াম গ্যারাল অভিন্ন। আমি প্রকৃতপক্ষে জোয়াম ডাকস্টা। আমি সত্যিই সেই নিরপরাধ মানুষ যাকে আইনের ভুলে পঁচিশ বছর আগে আসল অপরাধীর জায়গায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ভগবানের নাম শপথ করেই আমি বলতে পারি আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।—ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন।'

'আপনার সঙ্গে আপনার লোকজনের কথাবার্তা আমি নিষিদ্ধ করে দিচ্ছি,' পুলিশের কর্তা বলে উঠলেন, 'আপনি আমার আসামী, জোয়াম গ্যারাল। আমি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কঠোর ভাবেই কার্যকর করতে চাই।'

জোয়াম গ্যারাল তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়েই তার আতঙ্ক গ্রস্ত সন্তান আর পরিচারকদের শান্ত করতে চাইলো।

'ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের আগে তাহলে মানুষের বিচারই পালিত হোক।'

তারপর মাথা নিচু না করেই জোয়াম গ্যারাল নৌকার বুকে ওর পা রাখলো।

বাস্তবিকই এ দৃশ্য দেখে মনে হলো আকস্মাৎ জোয়াম গ্যারালের মাথার উপর নেমে আসা এই ভীতিকর বজ্রপাত উপস্থিত সকলের মধ্যে একমাত্র তাকেই কোন রকম অভিভূত করতে সক্ষম হয় নি।

—•—